বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি

(১৯৭১-২০০১)

কাজী জাহেদ ইকবাল

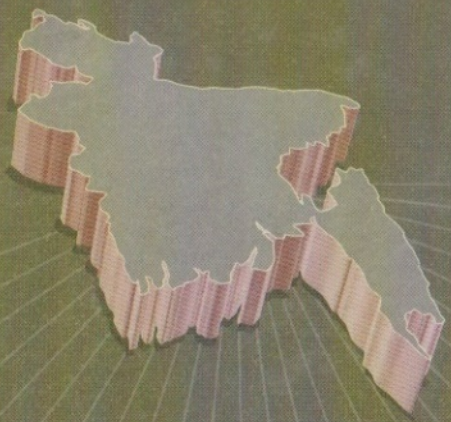

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি

(১৯৭১–২০০১)

কাজী জাহেদ ইকবাল

www.pathagar.com

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি
কাজী জাহেদ ইকবাল
প্রকাশক: কমলকান্তি দাস ও মোরশেদ আলম, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ৬৭ প্যারীদাস রোড, ঢাকা—১১০০। গ্রন্থস্বত্ব : লেখক। প্রচ্ছদ: সুখেন দাস। বর্ণবিন্যাস: অরণি কম্পিউটার, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড (৩য় তলা), বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০। মুদ্রণে:শাখি অফসেট প্রেস, ২ শ্রীসদাস লেন, ঢাকা—১১০০। প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০০২।
মূল্য : ৬০.০০ টাকা মাত্র।
BANGLADESHER PARARASHTRANITI (1971-2001) by Qazi Zahed Iqbal, Published by Kamolkanti Das & Morshed Alam, Jatiya Grantha Prakashan, 67 Pyaridas Road, Dhaka—1100. Copyright: Writer. Cover Design: Sukhen Das. Computer Compose: Oroni Computers, 34, North brook Hall Road, Dhaka 1100. Printer: Shakhi Offset Press, 2 Shris Das Lane Dhaka— 1100. Date of Publication: February 2002.
Price: Tk. 60.00, US$ 2.00

ISBN-984-560-176-6

www.pathagar.com

স্ত্রী, সমালোচক, বন্ধু, জ্ঞানের সহযাত্রী কেয়া কে।
এই গ্রন্থ তার নিরন্তর ত্যাগ ও উৎসাহের ফসল।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রাক্ কথন

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতিতে আমার যে আগ্রহ, তার নেপথ্য অনুপ্রেরণা সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে তার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকেই তিনি আমাকে প্রভাবিত করে চলেছেন। সেই প্রভাব সর্বব্যাপী!

আরও দুজন শিক্ষক আমাকে প্রতিনিয়ত গবেষক হতে—লিখতে বাধ্য করেন; তাঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিমেয়। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন তাঁদের প্রথমজন। এ গ্রন্থে তাঁর প্রত্যক্ষ অবদান আমাকে কৃতজ্ঞ করেছে দারুণভাবে। অন্যজন নূরুল হুদা আবুল মনসুর। তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা।

আমার পরিবারের সব সদস্যরাই এত সহযোগিতা করেন যে. তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতার কোন ভাষাই উপযুক্ত মনে হয় না।

কমলকান্তি দাস এবং মোরশেদ আলম জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনের দুই স্বত্বাধিকারী, আমার সুহৃদ, গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নেয়ায় তাঁদেরকে ধন্যবাদ।

কাজী জাহেদ ইকবাল

১১ জানুয়ারী ২০০২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ভূমিকা	১১
মুক্তিযুদ্ধকালীন পররাষ্ট্রনীতি	১৮
শেখ মুজিবুর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি	২৯
জিয়াউর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি	৪০
এরশাদের পররাষ্ট্রনীতি	৫২
বেগম খালেদা জিয়ার পররাষ্ট্রনীতি	৫৯
শেখ হাসিনার পররাষ্ট্রনীতি	৬৭
উপসংহার	৭৫
গ্রন্থপঞ্জি	৭৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

আধুনিক বিশ্বে যে কোন রাষ্ট্রের জন্য পররাষ্ট্র নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের সাফল্য, উন্নতি, অর্থনৈতিক অর্জন, এমন কি অস্তিত্ব পর্যন্ত নির্ভর করে সফল পররাষ্ট্র নীতির ওপর।

বাংলাদেশও এ প্রক্রিয়ার বাইরে নয়।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভের পর থেকে গত ত্রিশ বছরে দেশটির পররাষ্ট্র নীতি নানা উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে আজকের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

১৯৭১ সালে ৯ মাসব্যাপী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ পাকিস্তানী ওপনিবেশিক শাসন কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসে। কুড়ি শতক বাংলাদেশের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। ঐ শতকে দেশটি স্বাধীনতা অর্জনপূর্বক স্থিতি ও বিকাশ লাভ করেছে। এ গ্রন্থে পুরো কুড়ি শতক জুড়ে বাংলাদেশ যে পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করেছিলও তার ওপর আলোকপাত করা হবে। তবে গবেষণার স্বার্থে কলেবরটি ২০০১ সালের হাসিনা সরকারের মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত টেনে আনা হবে। আলোচনা শুরু হবে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে গঠিত প্রবাসী সরকারের বিদেশ নীতি থেকে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি আলোচনার পূর্বে তার রাষ্ট্রীয় অবস্থান, রাজনৈতিক কাঠামো, ইতিহাস এবং ভৌগোলিক অবস্থিতির ওপর সংক্ষিপ্ত দৃষ্টির দেয়ার প্রয়োজন।

১,৪৪,০২০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের বাংলাদেশের রাজধানী 'ঢাকা'। ঢাকা এ অঞ্চলের অন্যতম শহর; প্রাচীন নগরী। মোগল বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের প্রতিনিধি সুবাদার ইসলাম খান ১৬১০ মতান্তরে ১৬০৮ সালে ঢাকায় পৌছে একে প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

তারপর অনেক উত্থান-পতন ঘটেছে; কিন্তু ঢাকা নগর হিসেবে কখনোই অলক্ষ্যে চলে যায়নি। এটি তো রাজধানীর কথা। যে আয়তন নিয়ে আজকের বাংলাদেশ, তাকে ১৯৪৭ এর আগে আমরা কখনোই স্বতন্ত্র স্বত্বা হিসেবে দেখি না। এর বদলে ঐতিহাসিক আমল থেকেই বাংলা নামের যে অংশটি ইতিহাসবিদরা চিহ্নিত করেন, তাতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বত্তার অস্তিত্ব দেখি। আজকের বাংলাদেশও নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে এর-ই অংশ ছিল। দু-একবার যে বৃহত্তর বাংলা গঠনের প্রচেষ্টা হয়নি তা নয় কিন্তু মুসলিম শাসনের আগে সেই প্রচেষ্টায় খুব একটা সফলতা পাওয়া যায় নি। আরও স্পষ্টভাবে বাংলার একত্রীকরণ দেখা গেল ব্রিটিশ

www.pathagar.com

আমলে। তবে যে বাংলা নিয়ে এত কথা, সেই বাংলা নামটি চৌল রাজা রাজেন্দ্রচৌলের ত্রিমুলাই লিপিতে প্রথম লক্ষ্য করা যায়। নৃ-তাত্ত্বিকভাবে মোটা দাগে বাঙালিকে একটি সংকর জাতি বলা যায়। এর ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আনুমানিক ৭ম শতাব্দীর দিক থেকে বাংলা ভাষা গড়ে উঠতে শুরু করে। কেউ একে সংস্কৃতের দুহিতা, আবার কেউ বলেন এর উদ্ভব সরাসরি গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে। বৃহত্তর বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব অংশ ১৯৪৭ সালে ধর্মের দোহাই দিয়ে খণ্ডিতভাবে পাকিস্তানে যোগ দেয়। পাকিস্তানী শাসনে উৎপীড়িত পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী কাঠামো ভেঙে বাংলাদেশ নামের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা এত সহজে হয়নি। রক্তক্ষয়ী ৯ মাসের যুদ্ধ তো করা লেগেছেই, উপরন্তু স্নায়ুযুদ্ধতাড়িত বিশ্বে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিও সামাল দিতে হয়েছে প্রবাসী সরকারকে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির সেই শুরু। প্রবাসী সরকারের বিদেশনীতির লক্ষ্য ছিল একটিই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এ উদ্দেশ্যে ভারতকে সন্নিবেশিত করা, বিশ্বের পরাশক্তিগুলিকে বাংলাদেশের দাবির যৌক্তিকতা বোঝানো, সর্বপরি বিশ্ব জনমত গঠন। কাজটি স্নায়ু যুদ্ধের সময় খুব সহজ ছিল না। বিশেষ করে চীন-মার্কিন অক্ষের পাকিস্তান পন্থী ভূমিকার কারণে। এর ভেতরই প্রবাসী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তাক গংদের মার্কিন চক্রের সংগে আঁতাত পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছিল।। শেষ পর্যন্ত প্রবাসী সরকারের পররাষ্ট্র নীতি সফল ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশ-ই তার প্রমাণ।

স্বাধীনতা উত্তর সময়ে আওয়ামীলীগ সরকার গঠন করে। ১০ জানুয়ারী ১৯৭২ শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে সেই সরকারের দায়িত্ব নেন। তার বিদেশনীতিতে পরিষ্কার দুটি চ্যালেঞ্জ ছিল। স্বীকৃতি আদায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন। অবস্থা এতটাই জটিল ছিল যে, বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্যে বিদেশী সাহায্য এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। বাংলাদেশের ঐ সময়ের কূটনীতিকে স্বীকৃতি আদায়ের কূটনীতি বলা হয়। এ কূটনীতির সফলতা ছিল ঈর্ষণীয়। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ১১৬টি রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। তখন বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভেও সক্ষম হয়। স্বীকৃতি জরুরী ছিল এজন্য যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় শুধু ভারত এবং ভুটানের স্বীকৃতি পাওয়া গিয়েছিল মাত্র। সোভিয়েত ইউনিউয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ব্রিটেন সহ মুসলিম দেশগুলির স্বীকৃতি, স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের টিকে থাকার প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বীকৃতি ২৪ জানুয়ারী ১৯৭২-এ প্রদত্ত হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা নীরব-ই ছিল। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সাড়া মিলছিল ধীরে ধীরে। বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান ভেঙে বেরিয়ে আসায়

www.pathagar.com

মুসলিম দেশগুলো বাংলাদেশের প্রতি বিমুখ ছিল। অর্থনৈতিক ভাবে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্য বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সাহায্য অর্জন সহজ ছিল না। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনের প্রয়োজনে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি আদায়ের কূটনীতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক কূটনীতির পথও ধরতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ সহ অনেকে পুঁজিবাদী দেশগুলোর সাহায্য বা তাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক আদান-প্রদানে অনাগ্রহী ছিলেন। পুঁজি বিকাশে আকাঙ্ক্ষী, মধ্যবিত্ত প্রভাবিত দেশে ঐ চিন্তা ছিল স্ব-বিরোধী। ফলে শেখ মুজিবুর রহমানকে তার অবস্থান পরিষ্কার করতে হয় পুঁজি বিকাশের পক্ষে। তাজউদ্দীন আহমেদ অর্থমন্ত্রীর পদ হারান। বাংলাদেশ বাধ্য হচ্ছিল সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব এবং পুঁজিবাদী বিশ্বের ভেতর একটা ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে। শুধু সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব বাংলাদেশের পুরো চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে ছিল অপারগ। তা সত্ত্বেও এ পক্ষ ত্যাগ সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে পুঁজিবাদীরা ভারত-সোভিয়েত অক্ষে বাংলাদেশের অবস্থানকে ভাল চোখে দেখছিল না। অর্থনৈতিকভাবে বিদেশ নির্ভরতা কমানোর প্রয়াসও বিশেষ সফলতা পায়নি। ফলে অনিবার্যভাবে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়।

সেই সময় মুজিব সরকার ভারত–সোভিয়েত অক্ষের অধিকতর নিকটবর্তী ছিল। বিষয়টি পশ্চিমারা ভালভাবে নেয়নি। অন্যদিকে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে পশ্চিমাদের নিকটবর্তী হওয়ার প্রয়াস চলছিল। মুসলিম দেশগুলোর ঘনিষ্ট হওয়ারও প্রয়াস চলছিল। ওআইসি সম্মেলনে যোগদান, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফোর্ডের সঙ্গে বৈঠক, '৭৪ সালে ভুট্টোর সংগে বৈঠক প্রভৃতি ঐ প্রয়াসের-ই অংশ। এ প্রচেষ্টাকে ভারত বা সমাজতান্ত্রিক মিত্ররা মোটেও ভালভাবে নেয়নি। এখানেই লুকিয়ে ছিল মুজিব সরকারের প্রকৃত সংকটটি। ১৯৭৫-এর একদলীয় শাসন বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করার মাধ্যমে বিদেশ নীতির সংকটকে আরও তীব্র করে। শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ড বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে শূন্যের ঘরে নিয়ে আসে। পররাষ্ট্র নীতি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অসহায়ত্বের শিকার হয়।

হত্যাকাণ্ডের বেনিফিশিয়ারী আওয়ামী লীগ মন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহমেদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তার সম্পর্ক রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাকে অগ্রহণযোগ্য করে তোলে। ফলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির অসহায়ত্বের কোন উন্নতি ঘটেনি, যদিও মোস্তাক দেশকে পুরোপুরি পশ্চিমা বলয়ে নিয়ে আসেন। চীন-সৌদী আরবের মত দেশগুলো ঐ সময় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে, যদিও তাদের ঐ স্বীকৃতির প্রক্রিয়াটি মুজিব সরকারের সময় প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। সুতরাং পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে মোস্তাক সরকারের কৃতিত্ব সামান্যই।

www.pathagar.com

১৯৭৫ সালে ৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত ক্যু পাল্টা ক্যু-এর এক পর্যায়ে কর্নেল তাহেরের সহায়তায় জিয়া ক্ষমতায় আসীন হন। তিনি মোস্তাক সৃষ্ট পশ্চিমা ঘেষা পররাষ্টনীতি বহাল রাখেন। এতে করে বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তনটি শক্ত ভিত্তি লাভ করে। ফলে ভারত রুষ্ট হয়, রুষ্ট হয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোও। ভারতের সাথে সম্পর্ক সবচেয়ে তিক্ততায় পৌঁছে। অবশ্য মোরারজী দেশাই সরকারের কথা কিছুটা ভিন্ন। ১৯৭৯ সালে বহুদলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান তার ভাবমূর্তি অনেকটা উজ্জ্বল করেন। পররাষ্ট্র নীতিতে ইতিবাচক গতির সঞ্চার হয়। জাপানকে হারিয়ে বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়। বিদেশী সাহায্য, ঋন, বিনিয়োগ সন্তোষজনকভাবে পাওয়া যাচ্ছিল। এখানে বলা দরকার, জিয়া সরকারের পররাষ্ট্রনীতি, যদিও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মুজিব সরকারের পররাষ্ট্র নীতি থেকে ভিন্ন, তথাপি অর্থনৈতিক কূটনীতির মূলসূর ছিল এক-ই। অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই মুজিব পশ্চিমের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করছিলেন, আর জিয়াউর রহমান এখানে ছিলেন পুরোপুরি সফল। '৮১ সালে জিয়া হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের বিদেশনীতির ক্ষেত্রে আরেকটি চপেটাঘাত।

বিচারপতি আব্দুস সাত্তার জিয়া হত্যাকাণ্ডের পর সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এতে করে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সামান্য হলেও রক্ষা হয়। তিনি সাধারণ নির্বাচনেও জয়লাভ করেছিলেন। তার অনুসৃত বিদেশনীতি ছিল জিয়া সরকারের অনুসৃত নীতির-ই প্রতিফলন। কিন্তু সাত্তারের শেষ রক্ষা হয়নি। ১৯৮৪ সালের ২৪ মার্চ সেনাপ্রধান এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। তার এই কাণ্ড বিশ্ব রাজনীতিতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আর এক দফা ক্ষুণ্ন করে।

এরশাদ এক দশক দেশ শাসন করেছেন সেই অর্থে কোন সংগঠিত পররাষ্ট্র নীতি ছাড়াই। মূলত জিয়া সরকারের পশ্চিম ঘেঁষা নীতিটিই এরশাদ অনুসরণ করেছিলেন ছাড়া-ছাড়াভাবে। তবে তার সরকারের একটা সফলতা ছিল তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সভাপতিত্ব করা। অবশ্য ঐ সুযোগ ছিল নানা কারণে নিশ্চিত। এরশাদ সরকার ঢাকায় ওআইসি পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলন আয়োজনে সক্ষম হয়েছিলেন। সেটি ছিল গতানুগতি ধারায় প্রাপ্ত বাংলাদেশের পশ্চিমা ও ইসলামী দেশগুলোর সঙ্গে নিকট সম্পর্কের নিদর্শন। ১৯৮৫ সালের সার্ক সম্মেলনের আয়োজক ছিল বাংলাদেশ। এরশাদ তখন শাসক। যদিও সার্ক জিয়াউর রহমানের চিন্তা ও উদ্যোগের ফসল, তবুও আয়োজনের কৃতিত্ব এরশাদের। ১৯৯০ সালের এরশাদের স্বৈরশাসন বিরোধী গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৯১ সালের নিরপেক্ষ নির্বাচন বাংলাদেশের বৈশ্বিক ভাবমূর্তি সংগঠিত করার নতুন সুযাগ সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

১৯৯১ সালে নির্বাচিত হয়ে বিএনপি সরকার গঠন করে। খালেদা জিয়া সরকার গঠনের পর জিয়া অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতির দিকে ঝুঁকে যান। অবশ্য এরশাদও জিয়া সরকারের নীতি অংশত অনুসরণ করছিলেন। খালেদা জিয়া সরকারের সঙ্গে জিয়া সরকারের পররাষ্ট্র নীতির একটি মৌলিক পার্থক্য দেখা গেছে। পার্থক্যটি ভারত সংক্রান্ত। খালেদা সরকার ভারতের সঙ্গে সৌহার্দ্যের নীতি গুরুত্বের সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু নীতির সফলতা প্রশ্নাতীত নয়। প্রধান বিরোধীয় বিষয় নিষ্পত্তিতে তারা বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেননি, যদিও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি সাধিত হতে দেখা গেছে। মুসলিম দেশগুলো এবং পশ্চিমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার চেষ্টা চলেছে। কারণটি মুখ্যত অর্থনৈতিক।

বিএনপি সরকার তার অর্থনৈতিক কূটনীতির কথা খোলাখুলি বলেছিলেনও। তাদের অর্থনৈতিক সাফল্য অবজ্ঞা করার মত নয়। খালেদা সরকার তার শাসনামলে দু'টি স্পষ্ট চ্যালেঞ্জের সামনে পড়েছিলেন, একটি ফারাক্কা সংক্রান্ত, অন্যটি মায়ানামার সংক্রান্ত। ফারাক্কা বিষয়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘ পর্যন্ত দরবার করে সম্পর্কের বরফ গলাতে পারেনি। আর রোহিঙ্গা সমস্যাকে কেন্দ্র করে মায়ানমারের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধাবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল। বেশ কাঠখড় পোড়ানোর পর মায়নমারের সঙ্গে এক চুক্তির আওতায় রোহিঙ্গাদের ফেরত নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সেই মর্মে মায়ানমারে তাদের পুনর্বাসনও শুরু হয়। কিন্তু অত্যন্ত ধীর গতিতে। বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে বিএনপি আমলে এরশাদ সরকারের নষ্ট করা ভাবমূর্তি অনেকটা পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়। তবে কোন স্মরনীয় সাফল্য যোগ হয়নি। বিশ্বশান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ আশানুরূপভাবেই পরিচালিত হয়েছে।

১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি কে হারিয়ে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় চলে আসে। হাসিনা সরকার বিএনপির বিদেশ নীতি পুরোটা বাতিল করে দেয়নি। সেটি যে করবে না, তা তারা প্রকাশও করেছে। আওয়ামীলীগ সরকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষা সহ বিভিন্ন নীতির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে। তবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে নতুনতর উষ্ণতার সৃষ্টি হয়েছে। মুজিব সরকারের পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে হাসিনা সরকারের পররাষ্ট্র নীতির কিছু মিল বিশেষজ্ঞরা দেখতে পেলেও যুক্তিযুক্তভাবে হাসিনা সরকার মুজিব উত্তর সরকারগুলোর নীতিকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। পাশ্চাত্যের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে মুজিব সরকার যেমন তীব্র সংকটে পড়েছিলেন, হাসিনার তেমনটি হয়নি। এককেন্দ্রিক বিশ্বে অনেকটা সফলভাবে হাসিনা সরকার পাশ্চাত্য ঘেঁষা নীতি অনুসরণ করেছেন।

ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সমস্যাগুলোর অনেকটাই সুরাহা হয়েছে। ফারাক্কা সমস্যা সমাধানের ৩০ বছর মেয়াদী পানি চুক্তি হয়েছে। চুক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে

www.pathagar.com

বিরোধ থাকলেও এটি বড় অগ্রগতি নিশ্চয়ই। পার্বত্য বিরোধ মিটেছে '৯৭ ডিসেম্বরের চুক্তি অনুসারে। '৯৭ সালে বিতর্কিত ২৫ সালা মৈত্রী চুক্তির মেয়াদ শেষ হলেও হাসিনা সরকার ভারতের সঙ্গে ঐ চুক্তি নবায়ন বা অন্য চুক্তির উদ্যোগ নেয়নি। বিষয়টি সময়োচিত পদক্ষেপ হিসেবে নন্দিত হয়েছে। ব্যর্থতাও কম নয়। কমনওয়েলথ মহাসচিব পদে বাংলাদেশের প্রার্থীর ভরাডুবি প্রচুর সমালোচনার খোরাক হয়েছে। অর্থনৈতিক পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করলেও অর্থনৈতিক উন্নতি চোখে পড়ার মত নয়। ক্ষেত্রটি গতানুগতিক ধারায় চলেছে।

সর্বশেষ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল দুর্নীতির শীর্ষদেশ হিসেবে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করায় আওয়ামীলীগের বিদেশ নীতি বড় ধাক্কা খেয়েছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি মূলত নানামুখী রাজনৈতিক তৎপরতার দ্বারা পরিচালিত। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পররাষ্ট্র নীতির অবস্থান ও বদল হয়েছে প্রায়শই। তবে এরপরও এদেশের বিদেশ নীতিকে মোটা দাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একভাগে থাকে মুজিব সরকার এবং অন্যভাগে থাকে বাকী সরকারগুলো। তবে সব সরকার-ই তার অর্থনৈতিক প্রয়োজনের প্রশ্নে প্রায় এক-ই নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। এজন্য বাংলাদেশের কূটনীতিকে অর্থনৈতিক কূটনীতিও বলেন অনেকে।

অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সবগুলো সরকারকেই পশ্চিমা দেশ ও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর দিকে তাকাতে হয়েছে। এ নিয়ে অনেক বিব্রতকর অবস্থা এবং টানাপড়েনও অনেক সময় দেখা গেছে।

অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ একটি অত্যন্ত দরিদ্র দেশ। অবস্থা এতটাই নাজুক যে বিদেশী সাহায্য-ঋণ ইত্যাদি ছাড়া দেশ পরিচালনা সম্ভব নয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৈদেশিক বাণিজ্য বা এ ধরনের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থে দেশ চালানো সম্ভব না হওয়ায় বিদেশ নির্ভরতার প্রশ্ন এসেছে। দিন দিন বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কারণে এ বিদেশ নির্ভরতা বাড়ছে। আর অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য পশ্চিমা দেশ ও মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ দেশগুলোর সঙ্গে সু-সম্পর্কের কোন বিকল্প নেই। বিদেশ নির্ভরতা বাংলাদেশের জন্য কোন নতুন বিষয় নয়। পাকিস্তান আমলেও তা ছিল। তখন শূন্যতা অনেকটা পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়েছে। পাকিস্তানী পুঁজি তুলে নেয়ার পর স্বাধীন বাংলাদেশে উদ্বৃত্ত পুঁজির সংকট সৃষ্টি হয়। তখনই মূল প্রয়োজনীয়তাটি দেখা দেয় বিদেশী অর্থের। বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থায় উদ্বৃত্ত পুঁজির সুযোগ ছিল না। খাদ্যেও এক-ই অবস্থা ছিল। ফলে মুজিব সরকারকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ার নীতি নিতে হয়। এর বিরোধী হওয়া তাজউদ্দীন আহমেদকে সরে যেতে হয় অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। দেশে খাদ্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহণ করেই প্রো-ইসলামিক এবং পশ্চিমা ঘেঁষা বিদেশ নীতি অনুসরণ করেন। অবশ্য মুশতাক সরকার এর গোড়াপত্তন করেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিষ্ঠ ব্লকের সাহায্য এবং পাকিস্তানের অপপ্রচার গোড়াতে বাংলাদেশকে বিব্রত করলেও মুজিব সরকার সেটি সামাল দিয়েছিলেন। কিন্তু তার মর্মান্তিক হত্যাকান্ড সবকিছু এলোমেলো করে দেয়।

হত্যাকারীরা ক্ষমতায় বসে সঙ্গত কারণেই বিদেশ নীতিতে আমূল পরিবর্তন করে। জিয়া ক্ষমতা নিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্র নীতি নেন। তার আমলেই অর্থনৈতিক কূটনীতি সফলতা লাভ করতে শুরু করে। জিয়া প্রবর্তিত অর্থনৈতিক কূটনীতির ধারা এখনো প্রাহমান। জিয়াউর রহমান সরকার অর্থনৈতিক কূটনীতিতে অনেকটা সফল ছিলেন। তার সময়ে পরিস্থিতি সামান্য উন্নতিও হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তিতে এক-ই নীতি অনুসৃত হলেও নানা কারণে একই ফল পাওয়া যায়নি। অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কারনে বাংলাদেশের সরকারগুলো অর্থনৈতিক কূটনীতিতে দিন দিন মরিয়া আচরণ করেছে।

বাংলাদেশ তার পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কেন ও কিভাবে রাজনৈতিক নীতি বদলানো সত্ত্বেও অর্থনৈতিক নীতিতে অটল থেকেছে, বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা, দেশের পটপরিবর্তনের সঙ্গে বিদেশ নীতির সম্পর্ক, বৈশ্বিক রাজনীতিতে অবস্থান সহ বিদেশ নীতির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিত আলোচিত হবে।

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধকালীন পররাষ্ট্রনীতি

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির সূত্রপাত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে। কিন্তু এদেশের স্বাধীনতার জন্য অন্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ আরো আগে থেকে এমনি গুঞ্জন আছে। সেক্ষেত্রে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের যে পররাষ্ট্র নীতি, তার শেকড় প্রথিত আরো পেছনে। ১৯৬০ দশকে ভারতের সহায়তায় দেশ স্বাধীন করার চিন্তা থেকে কিছু যোগাযোগ হয়েছিল বলে জানা যায়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা অবশ্য এর ওপর ভিত্তি করেই দায়ের হলেও তখন সেটি অস্বীকৃত হয়েছিল।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাকিস্তান, বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে বাঙ্গালীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এপ্রিলের প্রথম ভাগ পর্যন্ত যে প্রতিরোধ চলছিল, তা ছিল স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা এবং বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ। এ সময়ের ভেতরই ১৯৭০ নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্যরা, বিপুল সংখ্যক স্বাধীনতাকামী মানুষ এবং পাকিস্তান বাহিনী থেকে বিদ্রোহী বাঙ্গালী সেনা, পুলিশ, ইপিআর সদস্যরা ভারতে আশ্রয় নেয়। ১৭ এপ্রিল প্রবাসী সরকার শপথ নেন মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায়, যা পরবর্তীতে মুজিব নগর নামকরণ করা হয়। একে রাজধানী ধরে স্বাধীন বাংলার যাত্রা শুরু। অবশ্য ১০ এপ্রিল-ই প্রবাসী সরকার গঠিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কালটা ছিল স্নায়ুযুদ্ধের সময়। বিশ্বের দেশগুলো দু'টি পরিষ্কার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধও এর বাইরে থাকতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধ কালে বিশ্বের একভাগে ছিল পুঁজিবাদী দেশগুলো এবং অন্যভাগে ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ। কিন্তু চীন সমাজতান্ত্রিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও তার অবস্থান ছিল পুঁজিবাদী দেশগুলোর পক্ষে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার সময় পাকিস্তান ছিল পুঁজিবাদী দেশগুলোর বন্ধু, আর ভারত সমাজতন্ত্রীদের। চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সখ্য ছিল, আর ভারতের ছিল বৈরিতা। অবশ্য ভারতের সঙ্গে চীনের যুদ্ধ-বৈরিতাই পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের একটা গাঢ় সম্পর্ক তৈরি করে। পাকিস্তানের মাধ্যমে পশ্চিমা দুনিয়ার সঙ্গে চীনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠছিল। এর নেপথ্যে ছিল চীন-সোভিয়েত নীতিগত ও সীমান্ত নিয়ে দ্বন্দ্ব। পুঁজিবাদীরা চাইছিল, সারা বিশ্ব সমাজতন্ত্র মুক্ত হোক। আর সমাজতন্ত্রীরা সারা বিশ্বকে সমাজতন্ত্রের ছায়া তলে চাইছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এ টানাপড়েনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল।

ভারত উপমহাদেশের একটি কৌশলগত গুরুত্ব বিদ্যমান ছিল। ভারত মহাসাগরের তীরে অবস্থিতি এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভেতর সংযোগ স্থাপনকারী এ বিশাল ভূখণ্ড স্নায়ু যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলি অবহেলা করতে পারেনি। স্নায়ু যুদ্ধের পক্ষগুলোরও নিজস্ব কারণে এ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার জরুরী ছিল।

'৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিগড় থেকে বেরিয়ে আসার পর এর সামরিক কৌশলগত গুরুত্ব, অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং রাজনৈতিক

www.pathagar.com

গুরুত্ব পরাশক্তিগুলোর দৃষ্টি এড়ায়নি। বিশ্বব্যাপী যে নয়া সাম্রাজ্যবাদ পুরনো প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদের স্থান দখল করছিল, ভারতীয় উপমহাদেশের বিপুল সম্ভবনার দিকে সেই নয়া সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টি পড়েছিল। যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হচ্ছিল, তখন ভারতীয় উপমহাদেশের ওপর প্রত্যক্ষ দৃষ্টি বা প্রভাব প্রতিষ্ঠার লড়াইতে যুক্ত ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন। আবার চীন এ অঞ্চল সন্নিহিত হওয়ায় তার নিজস্ব নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক স্বার্থের প্রশ্ন এর সাথে সম্পর্কিত ছিল।

এ অবস্থায় তিনটি পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেবিপক্ষে অবস্থান নেয়া জরুরী মনে করে। অন্য শক্তিগুলো বলা যায় নীরব-ই ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপমহাদেশের দিকে দৃষ্টি দেয় ১৯৫০ দশকের গোড়ার দিকে। এর আগ পর্যন্ত তাকে ইউরোপ এবং দূরপ্রাচ্যের সমস্যা নিয়ে বেশি ব্যস্ত হতে দেখা গেছে। তারও আগে বিশ্বরাজনীতির বিষয়ে মার্কিনীরা ছিল অনাগ্রহী এবং তাদের ঐ সময়ের কূটনীতিকে বলা হয় অন্তর্মুখী নীতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মার্কিনীরা বিশ্বরাজনীতির প্রতি আগ্রহী হয়। তখন শুরু হয় অন্য নতুন শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তার স্নায়ুযুদ্ধ।

১৯৫৪ সালে পাকিস্তানকে সিয়াটো চুক্তিতে গ্রহণের মাধ্যমে উপমহাদেশে তাদের উপস্থিতি ঘোষণা করে মার্কিনীরা। ভারত অবশ্য জোট নিরপেক্ষ মতে অটল ছিল, যদিও সোভিয়েতের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা দিন দিনই বাড়ছিল। উপমহাদেশে ভারত এবং পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রকেই পক্ষপুটে নেবার চেষ্টা চালিয়েছিল মার্কিনীরা। কিন্তু সফল ছিল কেবল পাকিস্তানের ক্ষেত্রে। পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থিতি মার্কিনীদের স্বস্তি দিয়েছিল। এখান থেকে কমিউনিষ্ঠ চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, তেল সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য, ভারত মহাসাগর সবকিছুর উপরই নজর রাখা সম্ভব। তাছাড়া এর দুই প্রান্ত দিয়ে ভারতকেও চাপের মুখে রাখা সম্ভব। পাকিস্তানের ক্ষতি মার্কিনীদের জন্য কাম্য ছিল না, যদিও পাকিস্তান নিজে মার্কিন নীতির দ্বারা অসন্তুষ্ট ছিল অনেকটা। চীনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ভারতের প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে মার্কিনীদের নিরপেক্ষতা পাকিস্তানকে চটিয়েছিল। ফলে পাকিস্তান চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলে, এমন কি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সখ্যতা গড়ার চেষ্টাও কম করেনি; তা অংশত সফলও হয়েছিল। কিন্তু ভারত সোভিয়েত সম্পর্ক তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ১৯৭০ দশকের শুরুতে পরিস্থিতি নতুন রূপ নেয়। পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় চীন-মার্কিন সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে শুরু করে। সমীকরণটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এমন দাঁড়ায় যে, চীনকে ভারসাম্য করার জন্য শক্তিশালী ভারত এবং প্রভাব রক্ষার জন্য, চীনের

www.pathagar.com

সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে ও ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অক্ষত পাকিস্তান তাদের কাম্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে বিষয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ছিল না। উপমহাদেশের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের যোগাযোগ ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে তার সক্রিয় আগমন ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময়। ভারতীয় মিত্র হওয়া সত্ত্বেও কোন পক্ষেই সে বিশেষ ভূমিকা রাখেনি তখন। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধেও সোভিয়েত ভূমিকা অনেকটা নিরপেক্ষ ছিল । ১৯৬৫ পাক-ভারতীয় যুদ্ধের মধ্যস্থতা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন এটা স্পষ্টতই প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয় যে, ভারত উপমহাদেশে তার প্রভাব অগ্রগণ্য। '৭০ দশকের গোড়ায় ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ক উষ্ণতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। ঐ সময় চীনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত শীতল । উপমহাদেশে প্রভাব নিশ্চিত করা সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্নায়ু যুদ্ধের সময় ভারত মহাসাগর দেশটির নিরাপত্তা ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে বেশগুরুত্বপূর্ণ ছিল । সোভিয়েত ইউনিয়নের একসময় উষ্ণ সমুদ্রবন্দরের অভাব ছিল। ১৯৭০ দশকে যদিও সেই অভাব ছিল না; কিন্তু ভারত মহাসাগর বা তার সন্নিহিত এলাকায় মার্কিনী বা তার মিত্রদের প্রভাব সোভিয়েতের জন্য বিপদজ্জনক ছিল। চীন-পাকিস্তান-মার্কিন শক্তি মিলে উপমহাদেশে এমন এক ত্রয়ীর উত্থান হচ্ছিল যে, এতে সোভিয়েত মিত্র ভারতের সমস্যা তো হচ্ছিলই, খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব খর্ব হবার জোগাড় হয়েছিল। চীনের সঙ্গে শীতল সম্পর্ক, পাকিস্তানের সঙ্গে শত্রুপক্ষের আতাঁত মিলে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য সমীকরণটি দাঁড়ায়— উপমহাদেশে একটি পরিবর্তন এলে তার লাভ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়নের মত চীনের জাতীয় স্বার্থ অতটা আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল না। অন্তত '৭০ দশকে। তার স্বার্থ জড়িত ছিল আঞ্চলিক রাজনীতির ভেতর। পরাশক্তি হিসেবেও সে বিশেষ গুরুত্ব বহন করত না। সীমান্ত বিরোধ নিয়ে ১৯৬২ সালের যুদ্ধ তাকে ভারতের শত্রুতে পরিণত করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে নীতিগত ও জাতীয় স্বার্থগত বিরোধ আঞ্চলিক রাজনীতিতে চীনকে কোনঠাসা করে ফেলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধ তো ছিলই। একমাত্র মিত্র পাকিস্তান। সেই পাকিস্তান-ই '৭০ দশকের গোড়াতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়। এখানে বলা দরকার, তাইওয়ান সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে চীন যে নাজুক অবস্থায় ছিল, তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পাকিস্তানের ঐ উদ্যোগ খুব জরুরী ছিল। পাকিস্তানের প্রতি চীনের কৃতজ্ঞতার নমুনা আমরা পরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে প্রদত্ত ভেটোর মাধ্যমে দেখবো। সুতরাং পাকিস্তানের অখণ্ডতা এবং জাতীয় স্বার্থ চীনের স্বার্থের সংগে জড়িত ছিল।

www.pathagar.com

উল্লেখিত পেক্ষাপটে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পরিণতির দিকে যেতে হচ্ছিল। সংশ্লিষ্ট পরাশক্তিগুলো এবং ভারত ওপরের সমীকরণের দিকে তাকিয়ে ভূমিকা রাখছিল। ফলে মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনায় প্রবাসী সরকারকে অত্যন্ত দক্ষতা ও সতর্কতার পরিচয় দিতে হয়েছিল। পররাষ্ট্র নীতির সফলতার ওপর-ই মুখ্যত স্বাধীনতা নির্ভর করছিল। এমন কি সামরিক সাফল্যও। পররাষ্ট্র নীতির সাফল্য ছাড়া সামরিক সাফল্যের প্রশ্ন খুব-ই জটিল হয়ে পড়তো। আর শুধু সামরিক সাফল্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব ছিল কিনা, তা-ও বলা কঠিন।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে, এর সাফল্যের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র অত্যন্ত নিবিড়। সুতরাং ভারতের অবস্থান ব্যাখ্যা ছাড়া ঐ সময়ের পররাষ্ট নীতি আলোচনা বাতুলতা।

দক্ষিণ এশীয় রাজনীতিতে ভৌগোলিক এবং জনসংখ্যার দিক থেকে ভারত অন্যতম প্রধান নিয়ন্তা শক্তি। পাকিস্তানের সঙ্গে তার বৈরিতা জন্মলগ্ন থেকে। ১৯৭১ সালের আগেই কাশ্মীর নিয়ে তারা দু'দু'বার লড়েছে। চীনের সঙ্গেও শত্রুতা। ১৯৬২-তে এক সংক্ষিপ্ত যুদ্ধে চীনের কাছে পর্যদস্তু। সুতরাং বৈরী প্রতিবেশীর ভেতর তার অবস্থান। বিশ্বশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক অত নিবিড় না হলেও চীন বিরোধিতা থেকে একধরনের সহ অবস্থান ছিল। ভৌগোলিক ভাবে দেশের দুই প্রান্তে পাকিস্তানী ভূ-খণ্ড হওয়া সামরিক দিক থেকে ভারত বেশ চাপের মুখে ছিল। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান ভারতের সেভেন সিস্টার্স নামের সাত রাজ্যের জন্য বেশ হুমকি ছিল। কেননা, ঐ সাত রাজ্যে যাবার পথটি সামান্য চওড়া। এর একপাশে পূর্ব পাকিস্তান, অন্যপাশে চীন ও নেপাল। ফলে পাকিস্তান ভাঙলেই কেবল ভারতের নিরাপত্তা অনেক বেশি নিশ্চিত হয়।

২৫ মার্চ কালো রাত্রির পর তাজউদ্দীন আহমেদ সহ বেশিরভাগ আওয়ামী লীগ নেতা ভারতে আশ্রয় নেন। শুধু আওয়ামী লীগ নয়, ন্যাপ সহ স্বাধীনতার সপক্ষের সব দলের নেতারাই ধীরে ধীরে ভারতে আসেন। বাঙ্গালী সৈন্য পুলিশ বিডিআর সহ লক্ষ লক্ষ মানুষ এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের ভেতরেই ভারতে আশ্রয় নেয়। পরিস্থিতির কারণেই ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে যায়। ভারতের জড়িত হবার অন্তত চারটি কারণ চিহ্নিত করা যায়। প্রথমতঃ চির শত্রু পাকিস্তানকে শায়েস্তা করা, দ্বিতীয়তঃ আওয়ামী রাজনীতির সঙ্গে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের নীতিগত মিল তৃতীয়তঃ মানবিক কারণ এবং চতুর্থতঃ পাকিস্তানের উগ্র এবং দায়িত্বহীন আচরণের মাধ্যমে ঘটনার সঙ্গে ভারতকে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ফেলা।

www.pathagar.com

২৫ মার্চ ক্রাক ডাউনের পূর্বে মার্চের গোড়ার দিক থেকে আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ভারতের সাহায্যের চিন্তা করছিলেন। কিন্তু বিষয়টি সহজ ছিল না। বিশেষ করে ইসলামাবাদস্থ ভারতীয় হাইকমিশন এসবে খুব সাড়া দিচ্ছিল না। মুজিবের নির্দেশে তাজউদ্দিন আহমেদ ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার কে. সি. সেনগুপ্তের সঙ্গে ৬ মার্চ এবং ১৭ মার্চ দু'দফা বৈঠক করেন। ২৪ মার্চ তৃতীয় বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও হয়নি। তাজউদ্দিন ভেবেছিলেন, তার অজান্তে কোন রফা মুজিবের সঙ্গে ভারতীয়দের হয়ে থাকবে। কিন্তু ২৫ মার্চ তাজউদ্দীনের ভূল ভেঙ্গে যায়। দেখতে পান, কোন রফাই হয়নি। বিএসএফ প্রধান রুস্তমজীর সঙ্গে আলোচনা করে বুঝতে পারেন, ভারতের সাহায্যের বিষয়টি গোড়া থেকেই শুরু করতে হবে।

তাজউদ্দীন দ্রুত দিল্লি গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহতেই দু'দফা বৈঠকে একটি প্রবাসী সরকারের বিষয়ে জোর দেন ইন্দিরা। কূটনৈতিক কারণেই তাজউদ্দীনকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। দিল্লিতে উপস্থিত আওয়ামীলীগ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী করে একটি সরকার গঠন করেন। মুজিবের অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পান। সরকার গঠন নিয়ে আওয়াগীলীগে মনোমালিন্য হলেও রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ দারুণভাবে লাভবান হয়। ১০ এপ্রিল প্রবাসী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত এবং ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে শপথ নেয়। ফলে বিশ্বে বাংলাদেশের একটি বৈধ সংগঠিত প্রতিনিধিত্ব প্রকাশ সম্ভব হয়। অনেক সন্দেহও দূর হয়। আন্তর্জাতিক সাহায্য লাভ, বাংলাদেশের দাবি প্রচার, স্বীকৃতি নিয়ে দরবার করা অনেক সহজ হয়।

তাজউদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন প্রবাসী সরকার যখন প্রথম কূটনৈতিক চাল নিয়ে ব্যস্ত, তখন বিদেশের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশীরা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের দাবি তুলে ধরতে নেমে পড়েছেন। এর ভেতর শিক্ষাবিদ, কূটনীতিবিদ, ছাত্র, সবাই ছিলেন। প্রবাসীরা সারা দুনিয়ায় সহসাই বাংলাদেশের দাবি পৌঁছাতে শুরু করেন। ইউরোপে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী পাকিস্তানী হামলার সঙ্গে সঙ্গে কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন। বিচারপতি চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি জেনেভাতে মানবাধিকার সম্মেলনে অংশ নিচ্ছিলেন। এর আগেই অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্যের পদ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি দ্রুত ব্রিটিশ পররাষ্ট্র কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ শুরু করেন। স্যান্ডারল্যান্ডের মাধ্যমে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী প্রমুখের সঙ্গে আলোচনা করেন। এক পর্যায়ে

www.pathagar.com

প্রবাসী সরকার জনাব চৌধুরীকে বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ করে। স্বাধীনতার পক্ষে বিভিন্ন কাজ পরিচালনার জন্য ঐসময় ব্রিটেনে সকল বাংলাদেশীর সহায়তায় একটি কেন্দ্রীয় কমিটি ও একাধিক কমিটি গঠিত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাঙ্গালীদের ভেতরও দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ডঃ মোহাম্মদ ইউনুস, এস, এম, আলী, ডঃ মহিউদ্দীন আলমগীর, এ. এম. এ. মুহিত প্রমুখের নেতৃত্বে স্বাধীনতার স্বপক্ষে তারা সংগঠিত হতে শুরু করে। বিভিন্ন মিছিল, মিটিং প্রভৃতির মাধ্যমে স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠন ও প্রক্রিয়া শুরু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনমত গঠন স্বাধীনতার জন্য খুব-ই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, মার্কিন সরকারের অবস্থান ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে। ফলে জনমত সৃষ্টি করে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ ছিল কৌশল। সেই কৌশল সফলও হয়েছিল। জর্জ হ্যারিসনের মত বিশ্বনন্দিত সঙ্গীত শিল্পীর বাংলাদেশের পক্ষে কনসার্ট আয়োজন প্রচার নীতির সফলতার ইঙ্গিত বহন করে। ৪ আগস্ট এনায়েত করিম সহ একাধিক বাঙ্গালী কূটনীতিবিদ পক্ষত্যাগ করে স্বাধীনতার পক্ষ নিলে প্রচারকারীদের প্রকৃত সাফল্য প্রকাশ পায়। এ্যালেন গিন্সবার্গের মত কবি বাংলাদেশের জন্য কবিতা লিখেছিলেন।

মুখ্যত ইউরোপ এবং আমেরিকায় প্রচার-প্রচারণা, কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ সুগমের চেষ্টা চলছিল। স্নায়ু যুদ্ধ নিয়ন্ত্রিতও হচ্ছিল ঐ সংস্থা থেকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং বিশ্বসম্প্রদায়ের সমর্থন লাভের জন্য ইউরোপ-আমেরিকার জনসমর্থন ও সরকারগুলোর সাহায্য খুবই জরুরী ছিল। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ তার প্রথম পর্যায়ের এ কূটনীতিতে দারুণ সাফল্য দেখায়।

খন্দকার মুশতাক আহমেদের নেতৃত্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ শুরু করে আনুষ্ঠানিক ভাবে। এপ্রিলের শেষদিক থেকে প্রবাসী সরকার সংগঠিত এবং সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। প্রবাসী সরকারের পররাষ্ট্র নীতিকে ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতির সমান্তরালে এগিয়ে নিতে হয়েছে।

এপ্রিল মাসের শেষদিক থেকে প্রবাসী সরকার বিশ্বের জনগণ ও সরকারগুলোর সমর্থন লাভের নিরন্তর প্রচেষ্টা শুরু করে। বিশেষ প্রতিনিধি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে সারা বিশ্বের প্রবাসী বাঙ্গালীরা দেশে দেশে সভা-সমাবেশ, জনসংযোগও সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার দাবি জানাতে থাকেন।

ইউরোপ এবং আমেরিকার বহু সংখ্যক রাজনীতিবিদকে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল করানো সম্ভব হয়। এসব অঞ্চলের জনগণ তাদের সরকারের ওপর দারুণ চাপ সৃষ্টি করেন বাংলাদেশের পক্ষ নেয়ার জন্য। পত্র-পত্রিকাগুলো পাকিস্তানের দারুণ সমালোচনা শুরু করে। এমন অবস্থায় পশ্চিমা সরকারগুলো বেশ অসুবিধায় পড়ে যায় পাকিস্তানের পক্ষ নেয়ার ক্ষেত্রে। এখানে বলা দরকার,

www.pathagar.com

সাইমন ড্রিংই প্রথম ক্রাক ডাউনের সংবাদ বিশ্বের দরবারে পৌছে দেন। পরে সরেজমিন প্রতিবেদনে আরো অনেক সাংবাদিক-ই প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেন। এর ভেতর এন্থনি মাস্কারান্‌হাস্ উল্লেখযোগ্য।

প্রবাসী সরকারের প্রতিনিধিরা বিশ্বের দেশে দেশে বাংলাদেশের পক্ষে নিরলস প্রচার-প্রচারণা চালিয়েছেন, ছোট্ট দেশ মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী স্যার সাগরকেও বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য আবেদন-নিবেদন করতে ছাড়েননি। কমনওয়েলথ মহাসচিব আর্নল্ড স্মীথের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিনিধি আবু সাঈদ চৌধুরী দেখা করেন। স্মীথের সহানুভূতি আদায়ে তিনি সক্ষম হন। স্মীথ শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য পত্র লিখতেও রাজী হয়েছিলেন।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদদের সহানুভূতি আদায় করা সম্ভব হয় দক্ষ কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে। ফ্রান্স, ব্রিটেনের মত পশ্চিমা দেশ পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন থেকে বিরত হয়ে যায়। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যে পাকিস্তানকে নানা কারণে সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্য দিচ্ছিল, তার-ই একাধিক সিনেটর-কংগ্রেসম্যান বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলতে শুরু করেন। এ ছিল বিরাট কূটনৈতিক বিজয়। এডওয়ার্ড কেনেডি তো রীতিমত সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য পূর্ব পাকিস্তান এবং কোলকাতার শরনার্থী শিবিরে আসেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে বাংলাদেশের হয়ে নিরন্তর লড়েছেনও। তার মত আরো অনেক সিনেটর এবং কংগ্রেসম্যানের চাপের মুখে সিনেটে-কংগ্রেসে পাকিস্তান প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন সাব কমিটিতে এ নিয়ে শুনানি হয়েছে। ফলে মার্কিন প্রশাসন পাকিস্তান নীতির ক্ষেত্রে অনেকটা সংযত হয়েছে। যদিও প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জার বেপরওয়া আচরণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এমন কি এক পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর পরমাণু হামলা করার কথাও তারা ভেবেছিলেন বলে কিসিঞ্জার জানিয়েছেন। কিন্তু তেমনটি কেন, আরো অনেক কিছু করা থেকেই নিক্সন প্রশাসনকে বিরত হতে হয়েছিল জনমত এবং রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ব্যক্তিদের অনেকের বাংলাদেশমুখী চাপের কারণে।

প্রবাসী সরকার যখন দেশের স্বাধীনতার জন্য সারা বিশ্ব জুড়ে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে চলছিলেন, তখন পর্দার আড়ালে অন্য প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছে। সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মুশতাক আহমেদ তার প্রতি অনুগত আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিনীদের সহায়তায় একটি সমঝোতার উদ্যোগ নেন। গোপন এ প্রচেষ্টা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে মরণাঘাতের শামিল। খন্দকার মুশতাকের প্রতিনিধি হিসেবে আওয়ামী লীগের এক এমপি কাইয়ুম কলকাতার মার্কিন দূতাবাসের কন্সাল গ্রিফিনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ইসলামাবাদের মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা করে

www.pathagar.com

ইতিবাচক সাড়া পান। মুশতাক গংদের এ তৎপরতা দ্রুতই প্রবাসী সরকার এবং ভারত সরকারের দৃষ্টিতে আসে। ঐ সময়ই একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে মুশতাকের জাতিসংঘে যাবার কথা ছিল। পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ায় মুশতাককে সরিয়ে আব্দুস সামাদ আজাদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করা হয়। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে দায়িত্ব দেয়া হয় জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিতে। খন্দকার মুশতাকের সঙ্গে তার পররাষ্ট্র সচিব মাহবুবুল আলম চাষীকেও সরানো হয়। বাংলাদেশ একটি বড় ধরনের চক্রান্ত এবং বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়।

বিচারপতি চৌধুরী প্রবাসী সরকারের নির্দেশ পেয়ে নিউইর্য়ক যান। সেখানে ১৬ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল নিয়ে জাতিসংঘে এবং বিভিন্ন দূতাবাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে লম্বা তৎপরতা শুরু করেন। বেলমান্ট প্লাজা হোটেলে অফিস বানিয়ে নিরলসভাবে প্রতিনিধি দল কাজ শুরু করেন। তারা বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে জাতিসংঘ দপ্তরে, বিভিন্ন দূতাবাসে গিয়ে নিরন্তরভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয় নিয়ে কাজ চালিয়েছেন।

বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসী সরকারের পররাষ্ট্র দফতর সহানুভূতিশীল অনুকূল সাড়া পেলেও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো ছিল ব্যতিক্রম। তারা পাকিস্তান ভাঙ্গার প্রচেষ্টাতে মোটেও রাজী ছিল না। বাংলাদেশের মানুষের ওপর পাকিস্তানীদের নারকীয় আচরণের বিরোধিতা করতেও ঐসব দেশ রাজী ছিল না।

বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার বিদেশে পাকিস্তানী দূতাবাসে কর্মরত বাঙ্গালীদের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেবার আহ্বান জানায়। কূটনৈতিকভাবে এর খুব-ই তাৎপর্যছিল। প্রবাসী সরকারের আহ্বানে দারুণ সাড়া পাওয়া যায়। কলকাতার হোসেন আলী, ইরাকে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত কূটনৈতিক এনায়েত করিম, সৈয়দ আনোয়ারুল করিম, এ. এম. এ. মুহিত প্রমুখ সহ আরো বিপুল সংখ্যক বাঙ্গালী কূটনৈতিক বাংলাদেশের পক্ষে যোগদান করেন। কূটনৈতিকদের একে একে দলত্যাগ পাকিস্তানের ভাবমূর্তি দারুণ ক্ষুণ্ন করে। এক-ই সঙ্গে বাংলাদেশের পক্ষে কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো যেমন সহজ হয়ে যায়, তেমনি বাঙ্গালীদের সকল মানুষের স্বাধীনতার তীব্র বাসনা প্রকাশ পায়।

ভারতে অবস্থানরত প্রবাসী সরকারের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল ভারত সরকারের সমর্থন, সাহায্য এবং তাকে বাংলাদেশের পক্ষে সক্রিয় রাখা। এক্ষেত্রে ভারতের ওপর প্রবাসী সরকারের চাপ ও কৌশল সফল-ই ছিল। অবশ্য অবস্থাটা এমনই ছিল যে, বাংলাদেশের সমান্তরালে না এগিয়ে ভারতেরও প্রায় উপায় ছিল না। ফলে ভারতও তার পররাষ্ট্র নীতিতে এমন কৌশল অবলম্বন করছিল, যাতে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের দাবির যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়। অক্টোবর

www.pathagar.com

নাগাদ বিশ্বব্যাপী এটা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় যে, বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য যৌক্তিকভাবেই লড়ছে এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনী গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞে লিপ্ত।

প্রবাসী সরকার ভারতের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির জন্য গোড়া থেকেই প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন সফলতা সত্ত্বেও এ বিষয়টি বিশেষ এগুচ্ছিল না। বাংলাদেশকে দ্রুত স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে ভারতের বেশ কিছু সমস্যা ছিল। বাংলাদেশকে আগেভাগে স্বীকৃতি দিলে পাকিস্তানের সঙ্গে প্রস্তুতির পূর্বেই যুদ্ধ বেধে যাবার সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া চীনা হামলার আশঙ্কাও কম ছিল না। ভারত চাইছিল, সব প্রস্তুতি আগে সম্পন্ন এবং শীতের অপেক্ষা করতে, যাতে চীন সীমান্ত বরফে ঢেকে গিয়ে চীনা হামলার সম্ভবনা কমে যায়। ভারত আরো চাইছিল, যদি সামরিক হস্তক্ষেপ করতে হয় তবে তা দ্রুত শেষ করতে।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ক্রমাগত ভারতের ওপর চাপ রাখা হচ্ছিল দ্রুত ব্যবস্থা নিতে। সেপ্টেম্বর মাসে তাজউদ্দীন আহমেদ এবং ভারতীয় সচিব বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের একটি মৈত্রী চুক্তি নিয়ে কথা বলেছিলেন। বেশ কিছু কথাবার্তা সত্ত্বেও সেই চুক্তি হয়নি। তবুও বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার ক্রমাগত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য।

ভারত পরিস্থিতি এবং নিজের রাজনৈতিক ও জাতীয় স্বার্থের কারণে সেনা অভিযানের চিন্তা গোড়া থেকেই করলেও অক্টোবর নাগাদ এর অনিবার্যতাকে অনুধাবন করে। এর আগে সম্ভাব্য বিপদজ্জনক পরিস্থিতির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারত ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট একটি ভারত সোভিয়েত একটি মৈত্রী চুক্তি সাক্ষর করে। এতে ভারত আক্রান্ত হলে সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপের বিধান রাখা হয়।

২৪ অক্টোবর থেকে ইন্দিরা গান্ধী ১৯ দিনের সফরে পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকা সফরে বের হন। এর আগে তাজউদ্দীন সহ আওয়ামী লীগ নেতারা ইন্দিরার সঙ্গে মিটিং করে প্রয়োজনীয় কৌশল ঠিক করেন। পশ্চিমা দেশগুলোতে মিসেস গান্ধীর সফর আশানুরূপভাবেই শেষ হয়। ৪ এবং ৫ নভেম্বর তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রকৃতপক্ষে বৈঠক যে খুব ফলপ্রসূ হয়েছে, তা নয়। কিন্তু কূটনৈতিক উদ্দেশ্য পূরন হয়েছিল। বিশ্বের সামনে ভারতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের সদিচ্ছা ফুটে উঠেছিল। আর সমস্যা সমাধানে তার যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের যৌক্তিকতাও প্রমাণিত হল।

বিশ্বব্যাপী প্রচার-প্রচারণা কূটনৈতিক তৎপরতার প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি নেয় ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী। ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্বের চুক্তির কারণে ভারতের সামরিক রসদাদি সরবরাহের নিশ্চয়তা এবং জাতিসংঘে যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনে সোভিয়েত ভেটোর নিশ্চয়তা ছিল।

www.pathagar.com

নভেম্বর মাসটি কূটনৈতিকভাবে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিনীরা ভারতের ওপর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ার জন্য দারুণ চাপ দিচ্ছিল। প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জার বিভিন্ন বিবৃতি হুমকির মাধ্যমে খোলাখুলি বলছিলেন। তারা চীনকে প্ররোচিত করছিলেন ভারতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে। কর্মপন্থা নির্ধারণে ঘণঘন মিটিং হচ্ছিল ওয়াশিংটনে।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে নভেম্বরেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ভারত চাইছিল পাকিস্তান-ই আনুষ্ঠানিক আক্রমণটা আগে করুক। সেজন্য সে প্ররোচিত করার কাজটিও করছিল। সময় লাগেনি। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান পশ্চিম ফ্রন্ট্রের বিভিন্ন ভারতীয় বিমান বন্দরে হামলা চালিয়ে কাজটি সমাধান করে। বাকিটা ইতিহাস।

বাংলাদেশ ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই ভারতীয় স্বীকৃতি পায়। প্রবাসী সরকারের কূটনৈতিক সফলতার সেটি ছিল চরম সাফল্য।

যুদ্ধের শেষদিকে প্রবাসী সরকারের পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় করার মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করা এবং বাংলাদেশের উদ্দেশ্য সফল করা। বহির্বিশ্বে এ পর্যায়ে যে অবস্থা চলছিল, বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিগুলোর ভূমিকা, তা ভারতকেই সামাল দিতে হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সীমাবদ্ধতা ছিল, তবে সহায়ক শক্তি হিসেবে সে যোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। সে ভূমিকা ছিল বিশ্বজনমত গঠন, লবিং, স্পষ্টভাবে স্বাধীনতার দাবি তুলে ধরা।

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে চীন-মার্কিন অক্ষ আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করে পাকিস্তান রক্ষার। সে চেষ্টা তারা আগেও করেছিল। ঐ পর্যায়ে তারা চেষ্টা করছিল অন্তত পশ্চিম পাকিস্তানকে অক্ষত রাখতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা ছিল, ভারত পাকিস্তানকে সামরিকভাবে এবং ভৌগোলিকভাবে একদম ধ্বংস করে দেবে। সেজন্য মার্কিনীরা পরমাণু যুদ্ধ রোধে প্রতিষ্ঠিত হটলাইনে সোভিয়েত ইউনিয়নকে চাপ দেয়, যেন তারা ভারতকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত না হানতে চাপ দেয়। ভারত অবশ্য পশ্চিম ফ্রন্টে বিশেষ আগ্রহী ছিল না অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক কারণে।

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী যখন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে, তখন মার্কিনীরা সামরিক উপায়ে হলেও পাকিস্তান রক্ষার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। ১২ ডিসেম্বর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভা ডাকা হয়। ঐদিনই চীনের বার্তাকে মার্কিনীরা ভুল বুঝে মনে করেছিল, চীন ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে। আর এতে করে ভারত-সোভিয়েত চুক্তির জন্য সোভিয়েত হামলার যে ভয় চীনের জন্য ছিল, তা প্রতিরোধে মার্কিনীরা পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি নিতেও রাজী ছিল। কিন্তু চীনের রাষ্ট্রদূত হুয়াং হুয়া যুদ্ধ নয় বরং জাতিসংঘের মাধ্যমে

www.pathagar.com

পাক-ভারত যুদ্ধ বিরতির বিষয়ে আগ্রহি জানালে একটি বড় ঝুঁকি দূর হয়, যদিও ততক্ষণে মার্কিন ৭ম নৌবহর বাংলাদেশের উপকূলের দিকে রওয়ানা দিয়েছে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থান এবং ভারতের অনমনীয় মনোভাবের কারণে ৭ম নৌবহর কোন ভূমিকা রাখার বদলে ভারত মহাসাগরে নিশ্চল অবস্থান নেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন অবশ্য জাতিসংঘেও বাংলাদেশের পক্ষে অনমনীয় ছিল। ৪ ডিসেম্বর এবং ১৩ ডিসেম্বর দু'দফা ভেটো দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিনী যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব ভণ্ডুল করে দেয়। ফলে পাকিস্তানের মৃত্যু অনিবার্য এবং মাকিন-চীন কূটনীতির ভরাডুবি হয়। শ্বরন সিং ১৬ ডিসেম্বর জাতিসংঘে পাকিস্তানের পরাজয়ের সংবাদ দেন। বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার শেষদিকে এ জটিল আন্তর্জাতিক ক্ষমতার লড়াইতে ভারতের পাশাপাশি যোগ্যতার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

প্রবাসী সরকার যখন নিশ্চিত হলো, স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ জরুরী এবং এক প্রকার অনিবার্য, তখনই তারা ভারত সরকারের সঙ্গে স্বাধীনতা এবং সম্ভাব্য দ্রুত ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়ে আলোচনা করেন। ভারতের সাড়া ছিল ইতিবাচক। আন্তর্জাতিক রাজনীতির কারণেই স্বাধীনতার পর ভারতের পক্ষে দ্রুত সৈন্য ফিরিয়ে নেয়া প্রয়োজন ছিল। ভারতের সঙ্গে এমনি একটি স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং পরবর্তীতে তা কার্যকর হওয়া প্রবাসী সরকারের ও পরবর্তী মুজিব সরকারের বড় কূটনৈতিক সফলতা ছিল।

www.pathagar.com

শেখ মুজিবুর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই প্রবাসী সরকার বাংলাদেশে ফেরার এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। প্রবাসী সরকার জানিয়েছিল তারা জোট নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন কূটনীতি অনুসরণ করবে। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলার সময় এক পত্রে প্রবাসী সরকার তার পররাষ্ট্র নীতির আরো পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিয়েছিল। তারা বলেছিল, বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ বিরোধী পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করবে। এর ভেতর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে শেখ মুজিবুর রহমান দেশে আসেন। তার নেতৃত্বে গঠিত হয় আওয়ামী লীগ সরকার। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তার সরকার যে পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করেছে, তাতে তার ব্যক্তি অবস্থান ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ত-াই নয়, তার সরকারের পররাষ্ট্র নীতি প্রবাসী সরকারের ঘোষিত পররাষ্ট্র নীতিকে সব সময় অনুসরণও করতে পারেনি।

১৯৭২-৭৫ সময়কালে আওয়ামী লীগের পররাষ্ট্র নীতিতে ব্যক্তি শেখ মুজিবুর রহমানের প্রভাব ছিল প্রকট। সদ্য স্বাধীন ক্ষুদ্র দেশ হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত প্রভাব দেশের পররাষ্ট্র নীতির জন্য অনেকটা সহায়ক হয়েছিল। বিশ্বের বহু দেশের বিখ্যাত সরকার প্রধানদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব তাদের পররাষ্ট্র নীতিতে দেখা গেছে। এ নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাও কম হয়নি।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এর বিদেশ নীতিকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সাজাতে হয়েছে। সরকারের সামনে পরিষ্কার দু'টি চ্যালেঞ্জ ছিল। **প্রথমতঃ** একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ এবং **দ্বিতীয়তঃ** অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানো। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কূটনীতির লক্ষ্য ছিল স্বীকৃতি ও সমর্থন। তখন অর্থনৈতিক প্রয়োজনের প্রশ্নটি অতটা প্রকট আকারে দেখা দেয়নি। তাছাড়া ভারত সহ বিভিন্ন স্থান থেকে প্রয়োজনীয় সাহয্য পাওয়া যাওয়ায় প্রবাসী সরকারকে ঐ দিকটি নিয়ে প্রায় ভাবতেই হয়নি। তারা কেবল ব্যস্ত ছিল স্বীকৃতি-সমর্থনের বিষয় নিয়ে। কিন্তু স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে অর্থনৈতিক সমস্যা প্রকট আকার নেয়। শুধু তা-ই নয় জনসংখ্যার আধিক্য, স্বল্প সম্পদ, শিল্পের অভাব প্রভৃতি মিলিয়ে সদ্য স্বাধীন দেশের সরকারের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। মড়ার ওপর খাড়ার ঘায়ের মত তার ওপর ছিল দুর্নীতির ভয়াল গ্রাস। অর্থনৈতিক প্রয়োজনের পাশাপাশি বিশ্ব সম্প্রদায়ের স্বীকৃতিও বাংলাদেশের জন্য খুব-ই প্রয়োজনীয় ছিল। প্রবাসী সরকারের স্বীকৃতি আদায় প্রচেষ্টার-ই ধারাবাহিকতা পরবর্তী মুজিব সরকারের ভেতর দেখা গেছে। মুজিব সরকারের প্রথম দিকে খুব অল্প সংখ্যক রাষ্ট্রই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা সহ অনেকের স্বীকৃতিই

www.pathagar.com

প্রয়োজন ছিল দেশের অস্তিত্বের স্বার্থে। সুতরাং সবদিক বিবেচনা করে বাংলাদেশ তার পররাষ্ট্র নীতির দু'টি লক্ষ্য স্থির করে। প্রথমতঃ স্বীকৃতি আদায় এবং দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক স্বার্থ নিশ্চিত করা।

স্বীকৃতি আদায়ের কূটনীতিতে শেখ মুজিব সরকার দারুণ সফলতা দেখিয়েছিলেন। মুজিব নিজে বাংলাদেশকে এশিয়ার সুইজারল্যান্ড হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এবং তার অব্যবহিত পরে মাত্র দু'টি দেশের স্বীকৃতি পাওয়া গিয়েছিল। ভারত এবং অপরটি ভূটান। ভূটান ১৭ ডিসেম্বর স্বীকৃতি দিয়েছিল। অন্য দেশগুলে,া এমন কি সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বীকৃতি পর্যন্ত তখনও পাওয়া যায়নি, যদিও বাংলাদেশের পক্ষেই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রদের অবস্থান। ১১ জানুয়ারী ১৯৭২ পোলান্ড, পূর্ব জার্মানী, মোঙ্গলিয়া প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক ঘরানার দেশগুলো স্বীকৃতি দেয়। সোভিয়েত স্বীকৃতি আসে ঐ মাসের-ই ২৪ তারিখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছিল না। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো এবং চীনও অনড় ছিল। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারির ৪ তারিখে ব্রিটেন ও পশ্চিম জার্মানীর স্বীকৃতির মাধ্যমে পশ্চিমা স্বীকৃতির শুরু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাওয়া যায় ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল। এ সময় দু'-একটি মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশের স্বীকৃতিও বাংলাদেশ লাভ করতে সক্ষম হয়। ইরাক-মিশর এদের অন্যতম। এমন কি পাকিস্তানের স্বীকৃতি পর্যন্ত আদায়ে সক্ষম হয় বাংলাদেশ। সেটি সম্ভব হয় ১৯৭৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী। শুধু বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতিই নয়, বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদও লাভে সক্ষম হয় বাংলাদেশ। এর ভেতর সবচেয়ে দুরূহ ছিল জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ।

বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছিল চীন। তাইওয়ানের বদলে চীন স্থায়ী সদস্য হবার পর প্রথম ভেটোটি দিয়েছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ নতুন উদ্যোগ নেয় জাতিসংঘের সদস্য হবার। কূটনৈতিকভাবে চীনের সঙ্গে রফা করারও উদ্যোগ নেয়া হয়। ফখরুদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ আনোয়ারুল করিম, হোসেন আলী প্রমুখ কূটনীতিবিদরা আলোচনার পর চীনের অবস্থান পরিবর্তনে সক্ষম হন। এক্ষেত্রে তারা মিশর, সেনেগাল প্রভৃতি দেশের সাহায্য নেন, যাদের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক ভাল। বিশেষ করে মিশরের ভূমিকা ছিল খুব-ই উল্লেখ করার মত। ১০ জুন নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রদান সংক্রান্ত বৈঠক বসে। পূর্ব সিদ্ধান্ত মতে, এখানে কোন প্রকার আলোচনা ছাড়াই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে সাধারণ পরিষদের নিকট বাংলাদেশের সদস্যপদের জন্য সুপারিশ করা হয়। বাংলাদেশ নির্বিঘ্নে তার সদস্যপদ লাভ করে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে কূটনৈতিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের বিরোধকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়েছিল। এটা করতে

www.pathagar.com

হয়েছিল, যাতে দেশ দু'টি পরস্পরকে আক্রমণ করতে গিয়ে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের প্রক্রিয়াটিকে ভণ্ডুল করে না দেয়। জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি বড় ধরনের অর্জন সম্ভব করে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ভেতরেই বহু সংখ্যক দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বলা যায়, স্বীকৃতি অর্জনের প্রক্রিয়াটি এর ভেতরেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। চীন ও সৌদী আরবের মত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দেশের স্বীকৃতি যদিও ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনার পরই পাওয়া গিয়েছে, তথাপি একথা বলতেই হবে, ঐ দু'দেশের সঙ্গে সম্পর্ক মুজিব আমলেই স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল এবং এমন কি '৭৫ শেষ নাগাদ তাদের স্বীকৃতিও আশা করছিল বাংলাদেশ। কিন্তু বাধা ছিল পাকিস্তান। চীন ও সৌদি আরব উভয়েই পাকিস্তানের সঙ্গে প্রদত্ত ওয়াদা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা যখন করছিল, তখনই ১৫ আগস্টের ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশ চীন-সৌদির স্বীকৃতি পায়। মুশতাক সরকারের কৃতিত্ব এতে সামান্যই।

শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বাপেক্ষা আলোচিত কূটনৈতিক উদ্যোগ ছিল ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি ১৯৭২। চুক্তিটি পরবর্তী সময়ে দারুণভাবে আলোচিত-সমালোচিত হয়েছে। এর ভিত্তিতে রয়েছে চুক্তির ৮ এবং ৯ নং ধারা। ঐ দুই ধারায় দ্বিপক্ষীয় নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে বলা হয়েছে। ৮ ধারায় বলা হয়েছে এক পক্ষ অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোন সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না। এক পক্ষ অন্য পক্ষকে আক্রমণও করবে না। এমন কোন কাজ করবে ন,া যাতে অন্য পক্ষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। ৯ ধারায় বলা হয়েছে— এক পক্ষের বিরুদ্ধে তৃতীয় পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হলে অন্য পক্ষ কোন ধরনের সাহায্য করবে না। তাছাড়া যে কোন পক্ষ আক্রান্ত হলে বা তেমন আশঙ্কা দেখা দিলে তা নিশ্চিত করার জন্য আলোচনা করে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। '৯ ধারা বলে ১৫ আগস্টের পর ভারতের হস্তক্ষেপের আশঙ্কাও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু চুক্তি নিয়ে যত কথাই বলা হোক না কেন ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ তার অবস্থান নিশ্চিত এবং স্বীকৃতি আদায় কূটনীতির আওতায় ঐ চুক্তিটি করেছিল বলে বিশেষজ্ঞদের অনেকে মত দেন। অবশ্য এ কথাও বলা হয়, যেখানে বাংলাদেশ তিন দিক দিয়েই ভারত দ্বারা ঘেরা, সেখানে এমন চুক্তির আবশ্যকতা কী? তবে চুক্তিটির মেয়াদ ১৯ মার্চ ১৯৯৭ সালে শেষ হওয়া অবধি এর তেমন কোন কার্যকারিতা বা প্রভাব দু'দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি।

পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি বাংলাদেশের বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে যুগপৎভাবে জটিল এবং স্পর্শকাতর। পাকিস্তানী অত্যাচার-নিপিড়ন তখনও বাঙ্গালীদের মনে জাগরুক ছিল। গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত পাকিস্তানী অফিসাররা ভারতে আটক ছিল। বিশেষ করে ১৯৫ জন চিহ্নিত যুদ্ধপরাধীর বিচারের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার ছিল বদ্ধপরিকর। অপরদিকে পাকিস্তান যে কোন কৌশলে দায়

www.pathagar.com

এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় ছিল। সম্পদ ভাগাভাগি, আটকে পড়া অবাঙ্গালীদের ফেরত নেয়া সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিরোধ ছিল চরমে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রথমদিকের প্রায় দু'বছর দু'দেশের কোন কূটনৈতিক যোগযোগ-ই ছিল না। ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতিসংঘের মহাসচিব কুটওয়ার্ল্ডহেম বাংলাদেশে আসেন। তার আলোচনাতেও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক, যুদ্ধবন্দী বিনিময় ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পায়।

১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে পি. এন. হাকসার এবং ডঃ কামাল হোসেন পাল্টাপাল্টি সফর করেন। সফরের পর ১৭ এপ্রিল যৌথ ঘোষণা দেয়া হয়। সেখানে পাকিস্তান-ভারত এবং বাংলাদেশ তিনপক্ষের আটকে পড়া লোকজন বিনিময়ের কথা বলা হয়। তবে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচারের কথা নতুন করে ঘোষণা দেয়া হয়। যদিও মুজিব সরকার শুরু থেকেই সে কথা বলে আসছিলেন; অথচ বিচার শুরু হচ্ছিল না। এ বিলম্বের ফলে বিশ্বের পরিস্থিতি অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানের ভূট্টো সরকার কূটনৈতিকভাবে অনেকটা সংহত অবস্থায় চলে এসেছিলেন। ১৯৫ জন যুদ্ধ অপরাধীর বিচারের বিষয়ে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া ছিল মারাত্মক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ মুসলিম বিশ্বের প্রচণ্ড চাপ ছিল বাংলাদেশের ওপর। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা দিল্লীতে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের পর ১৯৫ জন যুদ্ধ অপরাধীকে মুক্তি দেয়ার বিষয়ে একমত হন। বলা হয়, ২৮ আগস্ট ১৯৭৩ সালে দিল্লি চুক্তির মাধ্যমে বাকী যুদ্ধবন্দিদের মুক্তির সময় এদেরও পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হবে। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের পক্ষে ডঃ কামাল হোসেন, ভারতের শরন সিং এবং পাকিস্তানের আজিজ আহমেদ। এ চুক্তি ছিল পাকিস্তানের নিকট বাংলাদেশের বড় ধরনের কূটনৈতিক পিছু হটা।

১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় ইসলামী সম্মেলন সংস্থার বৈঠক। ঐ বৈঠকে বাংলাদেশের যোগদান নিয়ে দেন-দরবার শুরু হয়। সংস্থার মহাসচিব তোহামী ১৯৭৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সফরে আসেন। তারপর আসেন কুয়েতি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে ওআইসি প্রতিনিধি দল। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সম্মেলনে যোগ দেয়। সম্মেলনে বিভিন্ন মুসলিম দেশ যুদ্ধাপরাধীদের ছেড়ে দেয়ার জন্য প্রচণ্ড কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে। আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, বাংলাদেশ পিছু হটে আসে। '৭৪ সালেই পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

১৯৭৪ সালে ভুট্টো বাংলাদেশ সফরে আসেন জুলাই মাসে। তার সঙ্গে ১০০ সদস্যের প্রতিনিধি দল ছিল। তবে জুলফিকার আলীর বাংলাদেশ সফর নিয়ে বেশ মত দ্বৈততা ছিল। বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দলের একটা বড় অংশ ভূট্টোর

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সফরের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করছিলেন। ভূট্টো নিজেও বাংলাদেশ সফরের সময় যথেষ্ট দৃষ্টিকটু আচরণ করেছেন। এমন অভিযোগও আছে যে, তিনি এদেশে পাক-মনা লোকদের সংগঠিত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং বিপুল টাকা ঢেলেছিলেন। শেখ মুজিবের আচরণ ছিল অনেকটা আত্মরক্ষামূলক। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার কাছে নিশ্চিত তথ্য ছিল, ভূট্টো খন্দকার মুশতাক আহমেদ এবং প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দীন ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। এক দল সেনা কর্মকর্তার সঙ্গেও যোগাযোগ হয়েছিল। এত কিছুর পরও বাংলাদেশ ভূট্টোর সফরে তেমন লাভবান হতে পারেনি। ৫ লক্ষ আটকে পড়া পাকিস্তানী ফেরত নেয়া বা সম্পদ বন্টনের বিষয়ে তেমন অগ্রগতি হয়নি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বাংলাদেশ কেন দ্রুত পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথ ধরল। বিশেষ করে যুদ্ধ অপরাধী ফেরত, মুজিবের লাহোর ওআইসি সম্মেলনে যোগ দান, ভূট্টোকে দেশে আমন্ত্রণ প্রভৃতি। এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেয়া যাবে না। স্বাধীনতা উত্তর সময়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি যে ধরনের চাপের মুখে পড়েছিল, তাতে একটি নবীন দেশের পক্ষে অনেকটা বাধ্য হয়েই এমন পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রয়োজন ছিল অর্থনৈতিক সাহায্য এবং স্বীকৃতি। মধ্যপ্রাচ্য এবং পশ্চিমের নিকট থেকে তা পেতে হলে পাকিস্তানের সঙ্গে এক ধরনের রফা করা জরুরী ছিল। বলা যায়, ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টার পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিকে বদল করতেই হয়েছে। তখন পশ্চিমা ঘেষা ডঃ কামাল পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। ভারত বা কমিউনিষ্ঠ ব্লক বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে পারছিল না। ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরীণ মেরুকরণও ঐ ধরনের পরিবর্তনে অনেকটা অনুঘটকের কাজ করেছিল। এ ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার তাজউদ্দীনের মন্ত্রীত্ব হারানোর বিষয়টি স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন আওয়ামী লীগকে বিশেষ কোন সুবিধা দিয়েছিল— এমনটা ঢালাওভাবে বলা যাবে না। বরং পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ও পশ্চিমের দিকে দ্রুত সরতে গিয়ে তারা অনেক জটিলতার উদ্ভব ঘটিয়েছিল, যা পরে আলোচিত হবে। '৭৪-এর দুর্ভিক্ষ, দেশের বিশৃঙ্খলা, মুজিব হত্যাকাণ্ড, কোনটি থেকেই পররাষ্ট্র নীতির বদল আওয়ামী লীগকে বাঁচাতে পারেনি। বরং বিষয়টিতে আরো কৌশলী, ধীর-স্থির হবার সুযোগ ছিল।

ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক '৭৪ সাল থেকেই খারাপ হতে শুরু করে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও ভারত বিরোধী মনোভাব প্রবল হতে শুরু করেছিল ঐ সময়। ৭২-৭৩ সালের সম্পর্ক ছিল চমৎকার। '৭২ সালে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি হয়েছিল বাংলাদেশের আগ্রহে। দু'টি কারণে ঐ চুক্তি হয়েছিল। প্রথমতঃ বাংলাদেশ বিশ্বকে স্বাধীন সত্তার অস্তিত্ব জানান দিতে চেয়েছিল; দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যতে প্রয়োজনে ভারতের সামরিক সহযোগিতার নিশ্চয়তা লাভ।

www.pathagar.com

'৭২ সালে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি হয়। বাংলাদেশের জন্য চুক্তিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৭২ সালের প্রথম অর্ধে মুজিব ভারত সফরে যান। তাকে যে সম্মান তখন ভারতের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল, তা বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে বড় সাফল্য ছিল। মার্চে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফরে আসেন। এ সফরও ছিল অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ। সময়ের সাথে সাথে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক শিথিল হতে থাকে। এর পেছনে বৈশ্বিক এবং দ্বিপাক্ষিক কারণ ছিল। আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ পশ্চিমের দিকে সরে যাচ্ছিল, যা ভারতের জন্য মর্মপীড়ার কারণ ছিল। দ্বি-পাক্ষিকভাবে ভারতের সঙ্গে কিছু সমস্যাও তৈরি হচ্ছিল তখন। চোরাচালান, ভারতের বড় ভাই সুলভ আচরণ, পানি সমস্যা, সীমান্ত সমস্যা প্রভৃতি মিলিয়ে সম্পর্কের উষ্ণতা দ্রুত কমে যাচ্ছিল।

এ প্রেক্ষাপটে ১৯৭৪ সালের মে মাসে শেখ মুজিবুর রহমান ভারত সফরে যান। তখনই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটি স্বাক্ষরের সময় শেখ মুজিব অনেকটা আকস্মিকভাবে ভারতের নিকট বাংলদেশকে কিছু বেশি স্থান ছেড়ে দেবার প্রস্তাব দেন। ভারতীয় পক্ষ এতে অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। পরে যখন চূড়ান্তভাবে সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তখন নবীন ও দুর্বল প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ অনেকটা সুবিধা আদায়ে সক্ষম হয়। অবশ্য করিডোর বিষয়ক জটিলতা নিয়ে পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় ধরে আওয়ামী লীগ বিরোধী প্রচার চলেছে। কিন্তু বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ মনে করেন, ঐ সীমান্ত চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ দারুণভাবে লাভবান হয়েছিল। অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলাদেশ সীমানা বাড়াতে যেমন সক্ষম হয়, তেমনি ভারতের মত বড় প্রতিবেশীর সঙ্গে সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ মেটাতেও সক্ষম হয়।

গঙ্গার পানি বন্টন নিয়েও মুজিব আমলে লম্বা দেনদরবার হয়েছে ভারতের সঙ্গে। ফারাক্কা নিয়ে একসময় পাক-ভারত বিরোধও ঘটেছিল। ফারাক্কা বিরোধ নিয়ে আলোচনার আগে এর সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। ১৬৫১ সালে ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত হুগলী বন্দর ১৬৯০ সালে কলকাতায় সরিয়ে নেয়া হয়। ১৮৩৩ সালের ভেতরেই কলকাতা বন্দর রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা করার জন্য চাপ দেয় স্থানীয় বনিক সমিতি। ১৮৫৩ সাল থেকে এ নিয়ে গবেষণা শুরু হয় সরকারিভাবে। তখন থেকেই ফারাক্কায় বাঁধ দিয়ে ফিডার ক্যানেলের মাধমে গঙ্গার পানি ভাগীরথীতে এনে কলকাতা বন্দর রক্ষার চিন্তা করা হয়। কিন্তু একে বিভিন্ন সার্ভের মাধ্যমে নানা অর্থেই লাভজনক মনে করা না হলেও ১৯৫২ সাল থেকে ভারত এ নিয়ে নতুন চিন্তা শুরু করে। তারা ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের আপত্তি সত্ত্বেও ব্যারেজের কাজ শুরু করে ৭০ সালে শেষ করে। আরো চার বছর ধরে ফিডার ক্যানেল তৈরি করে। বাঁধটি ৭৫ ফিট উচু, ৭০০০ ফুট লম্বা এবং এর

www.pathagar.com

নির্মাণে খরচ হয়েছে ২০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পাকিস্তান আমলে এবং বাংলাদেশ আমলে ফারাক্কা বাঁধের প্রেক্ষিতে গঙ্গার পানির হিস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল শেখ মুজিবের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে একটি সাময়িক চুক্তি হয়। ঐ চুক্তি না হলে ভারতকে একতরফা ফারাক্কা বাঁধ চালুর মত নিন্দনীয় কাজ করতে হত। চুক্তিতে বাংলাদেশের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

মুজিব আমলে ভারত বাংলাদেশকে প্রায় ৮৩ মিলিয়ন ডলারের সাহায্য দিলেও চাহিদার তুলনায় তা অপ্রতুল ছিল। বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য ভিন্ন চিন্তা করতেই হয়েছিল। ভারত তাতে নাখোশ হয়। ২৮ মার্চ ১৯৭২ সালের বাণিজ্য চুক্তি বাংলাদেশ বাতিল করে দেয় আপন স্বার্থে। মুজিবুর রহমান ভারতকে এক পর্যায়ে বলেছিলেন, চোরাচালান বন্ধ না করলে বন্ধুত্ব থাকবে না। সুতরাং ভারতের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক মুজিব আমলের শেষদিকে উষ্ণতা হারিয়েছিল।

বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই মুখ্যত মধ্যপ্রাচ্য এবং পশ্চিমাদের দিকে মুখ ফেরাতে হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে আসার আগে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অংশ নিয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে স্বভাবতই এদের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নত হয়। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে সমাজতন্ত্রকে এবং পররাষ্ট্র নীতিতে জোট নিরপেক্ষতাকে গ্রহণের পর ঐ উষ্ণতা আরো সহজ হয়ে ওঠে। '৭২ সালের মার্চ মাসে শেখ মুজিবুর রহমান সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে যান । তিনি সেখানে গিয়েছিলেন সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রয়োজনের প্রশ্নটি সামনে নিয়ে। তাকে হতাশ হতে হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ সাহায্যের বেশি দিতে রাজী হয়নি যদিও একটা বাণিজ্য চুক্তি হয়েছিল। সামরিক সাহায্যের ক্ষেত্রে সোভিয়েত উদারতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। প্রথম দফা সর্বোচ্চ পর্যায়ের সফরের পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে আরো অনেক যোগযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু এর মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়নি। আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশ স্বীকৃতি আদায়ের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কূটনীতি অনুসরণ করছিল। ফলে তাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিকল্প অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই চিন্তা করতে হচ্ছিল।

অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রেও এ কথা সমান সত্যি। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আদান-প্রদান, ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় সাহায্য ঐসব দেশ থেকে পাওয়া যায়নি। তবু ৭২-৭৩ সালে এ সূত্রের ওপর বেশি

www.pathagar.com

নির্ভর করতে হয়েছে। যদিও ক্ষেত্রবিশেষে ঋণের শর্ত কঠিন ছিল এবং দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন পড়েছিল।

বাংলাদেশ সম্পর্কেও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের মোহভঙ্গের ব্যাপার ছিল। '৭৪ সালের ভেতরেই তারা অনুমানে সক্ষম হয়, বিপুল পাশ্চাত্য শিক্ষিত মানুষ এবং দুর্বল কাঠামোর কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নেই। বাংলাদেশও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে পশ্চিম ও মধ্যপ্রাচ্যের দিকে সরে আসা জরুরী মনে করছিল। নানা কারণে বাংলাদেশের ওপর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর আস্থা কমিয়ে দিচ্ছিল দিন দিন।

স্বাধীনতা পরবর্তী কিছুদিনের ভেতরেই বাংলাদেশ পশ্চিমা সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে। ফলে পররাষ্ট্র নীতিতে পশ্চিমাদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রবণতা শুরু হয়। দু'-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া পাশ্চাত্য দেশগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। মার্কিনীরা তো রীতিমত সামরিকভাবে হস্তক্ষেপের উপক্রম করেছিল। সুতরাং এসব দেশের বিরুদ্ধে দেশে বিপুল জনমত শান্ত হতে বেশ কিছু সময় দরকার ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রয়োজন ছিল প্রকট।

পশ্চিমা বিরোধী মনোভাব দেশে প্রকট থাকলেও স্বাধীনতার পর থেকেই পশ্চিম থেকে বাংলাদেশ মানবিক সাহায্য পাচ্ছিল। '৭২ এপ্রিলে স্বীকৃতি দানের আগে একজন কন্সাল বাংলাদেশে মার্কিন প্রতিনিধিত্ব করতেন। তাঁকে কূটনৈতিক মর্যাদা দেয়া হত। অন্যান্য পশ্চিমা দেশের সঙ্গেও দ্রুতই সম্পর্ক স্থাপিত হতে শুরু করে।

বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমাদের সু-সম্পর্ক স্থাপনের কেন্দ্রস্থলে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গোড়া থেকেই দেশটি বাংলাদেশেকে সাহায্য-সহযোগিতা দিলেও সম্পর্ক তেমন উষ্ণতা পায়নি। '৭৪ সালে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের সময় যখন বেপরওয়াভাবে খাদ্য প্রয়োজন, তখন ডঃ হেনরি কিসিঞ্জারের পরামর্শে কিউবার সঙ্গে সম্পর্কের অজুহাতে সাহায্য দান স্থগিত করা হয়। বাংলাদেশ বাধ্য হয় কিউবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘে ভাষণ দেয়ার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ভারত যান। ঐ সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফোর্ডের সঙ্গে তার এক স্বল্পস্থায়ী বৈঠকও হয়। কিন্তু বৈঠক যে খুব ফলপ্রসূ ছিল, এমনটি বিশেষজ্ঞরা বলেন না। অক্টোবরের শেষদিকে হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশ সফরে আসেন। তার আগেই তাজউদ্দীনকে অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যেতে হয়। তারও আগে '৭৩ সালের প্রথমদিকে পশ্চিমাপন্থি ডঃ কামাল হোসেন' আব্দুস সামাদ আজাদের স্থানে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। কিসিঞ্জার একসময় যদিও বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলেছিলেন, তবুও '৭৪ সালের শেষদিক থেকে বাংলাদেশের পশ্চিমামুখী নীতি স্পষ্ট হচ্ছিল। মুজিব আমলে বাংলাদেশ যত চেষ্টাই করে থাকুক, পশ্চিমারা তাকে সন্দেহের চোখেই দেখেছে।

www.pathagar.com

জাপানের সঙ্গেঁ সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অনেকেটাই ফলপ্রসূ হয়েছিল। '৭৩ সালের অক্টোবরে শেখ মুজিব জাপান সফরে যান। যমুনা সেতু নিয়ে এ সময় জাপানের সঙ্গে আলোচনা ও এক ধরনের নীতিগত সমঝোতায় আসতে পেরেছিলেন মুজিব সরকার। জাপান দ্রুত বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সহায্যকারী দেশে পরিণত হয়। জাপানের সঙ্গে সম্পর্কের তেমন উত্থান-পতন কখনোই দেখা যায়নি।

শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা জাপান নয়, পুঁজিবাদী বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গেও সু-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরা বাংলাদেশকে সাহায্য দানের জন্য গড়ে তোলে এইড টু বাংলাদেশ কনসোর্টিয়াম। এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিভিন্ন প্রকার সাহায্য দেয়া হয়। এটি দেশের অর্থনৈতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের সাফল্য।

মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্থাপন বেশ জটিল ছিল। স্বাধীনতার সময় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো সহ বেশিরভাগ মুসলিম দেশ বাংলাদেশের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করত। বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং বিশেষ করে অর্থনৈতিক কারণে এসব দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন জরুরী ছিল। অর্থনৈতিক প্রয়োজন এতটা জরুরী ছিল যে, বাংলাদেশকে মুসলিম দেশগুলোর সন্তুষ্টির জন্য অনেক নীতিগত বিষয়ে পিছু হটতে হয়েছিল। বাংলাদেশের জন্য মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সু-সম্পর্ক স্থাপন প্রক্রিয়া সহজ ছিল না। অত্যন্ত জটিল এবং কৌশলী পররাষ্ট্র নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে অগ্রসর হতে হয়েছিল।

১৯৭২ সালে আফ্রো-এশীয় সংহতি সংস্থার (AAPSO) সম্মেলনে বাংলাদেশে পাকিস্তানের গণহত্যার নিন্দা জানানো হয় এবং ঐ সম্মেলনে মুসলিম দেশগুলোর সমর্থনে বাংলাদেশ আফ্রো-এশীয় সংহতি সংস্থার সদস্য নির্বাচিত হয়। মূলত এ সংস্থায় যোগদানের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ স্থাপিত হয় বাংলাদেশের। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য হবার সময় বাংলাদেশ মিশর, ইরাক এবং দক্ষিণ ইয়েমেনের সমর্থন লাভ করে।

'৭২ সালের আগে কোন মুসলিম দেশ-ই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া এ প্রক্রিয়ার প্রথম স্বীকৃতি দানকারী। পরে '৭৫ সালের ভেতর প্রায় সব মুসলিম দেশের-ই স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব হয়। এমন কি পাকিস্তানেরও।

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারির লাহোর ইসলামী সম্মেলনে যোগ দিয়ে, সদস্য পদ পেয়ে, বাংলাদেশের সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ক চূড়ান্ত আকার পায়। বাংলাদেশ '৭৩ সালের আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের সময় আরব দেশগুলোর প্রতি জোর সমর্থন দিয়েছিল। এমনকি শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ যুদ্ধের সময় মিশরীয় বাহিনীর জন্য পাঠানো হয় এক লক্ষ পাউন্ড চা। এছাড়া একটি ২৮ সদস্যের মেডিকেল টিম

www.pathagar.com

পাঠানো হয়েছিল। স্বেচ্ছা যোদ্ধা হিসেবে যাবার জন্য ৫০০০ সদস্যের একটি মুক্তিযোদ্ধা দল তৈরি হয়েছিল। এরপর দ্রুতই আরব দেশগুলো বাংলাদেশের দিকে ফিরতে শুরু করে।

বাংলাদেশ কূটনৈতিকভাবে নিকটবর্তী হবার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো, বিশেষ করে তেল সমৃদ্ধ দেশগুলো থেকে সাহায্য আসতে শুরু করে। সাহায্য বা ঋন আকারে মুখ্যত দেশগুলো অর্থ দিয়েছে। ঋণের ভেতর ০ থেকে ৪.৫০ ভাগ সার্ভিস চার্জ যুক্ত ছিল। ফেরত দেয়ার সময়সীমা ১২ বছর হতে ৩০ বছর পর্যন্ত। এ অর্থ বাংলাদেশকে স্বাধীনতা উত্তর অর্থনৈতিক অনটনের হাত থেকে অনেকটা রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

মুজিব সরকার বাকশাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের পররাষ্ট্র নীতিতে এক জটিলতা নিয়ে আসেন। সাফল্যের গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। পশ্চিমা দেশগুলো একে সমাজতন্ত্রের দিকে সরে যাওয়া ভেবে বাংলাদেশের বিষয়ে সতর্ক হয়ে যায়। আবার অর্থনৈতিক কারণে পশ্চিমা বা পুঁজিবাদীদের দিকে মুখ ফেরানোতে ভারত এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্কে ফাটল ধরেছিল আগেই বলা হয়েছে। ফলে ৭৫ সালে এসে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি একটি সংকটে পড়ে যায়।

'৭৫ সালের ১৫ আগস্টের আগেই বাংলাদেশ বিশ্বের প্রায় সবকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য পদ লাভে সক্ষম হয়। এর ভেতর ছিল জাতিসংঘ, ওআইসি, কমনওয়েলথ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রভৃতি।

১৫ আগস্ট এসে বাংলাদেশ হঠাৎ এক অচেনা রাস্তায় চলতে শুরু করে। ঐদিন খুব ভোরে একদল সৈন্য কতিপয় জুনিয়র অফিসারের নেতৃত্বে দেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে বসে। এমনি আকস্মিক ঘটনার বিষয় কেউ-ই সেভাবে অনুমান করতে পারেনি। তবে একটি বিপদজ্জনক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সাবধানতার কথা অনেক স্থান থেকে আগেই উচ্চারিত হয়েছিল। এমন কি মিশরীয় গোয়েন্দা সংস্থাও সতর্কতার জন্য বাংলাদেশকে জানিয়েছিল। কিন্তু মুজিব সরকার কোন ব্যবস্থাই নেয়নি বা নিতে পারেনি। হাস্যকরভাবে সেনা গোয়েন্দা সংস্থা কোন আগাম তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়। হত্যাকাণ্ডের পর ফারুক-রশীদ গং খন্দকার মুশতাককে ক্ষমতায় বসায়। মুশতাক মুজিবের মন্ত্রী ছিলেন। এছাড়া আরো অনেক মুজিব মন্ত্রী ও নেতাদের মুশতাকের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল।

মুশতাক ক্ষমতা গ্রহণ করে এমন কোন নাটকীয় কাণ্ড করতে পারেন নি। তিনি ছিলেন মেজর গংদের হাতের পুতুল। মুজিব হত্যাকাণ্ডে বিদেশী সংযোগ পরবর্তীতে প্রমাণ করা যায়নি, যদিও তেমন অভিযোগ বিদ্যমান। অভিযোগ ওঠার কারণ বেশ কিছু ঘটনা পরম্পরা। পাকিস্তান এবং মার্কিনীদের অনেক গবেষক অনুসন্ধানকারীই এ নিয়ে আঙ্গুল তুলেছেন।

www.pathagar.com

মুশতাক সরকার ভারত এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো থেকে দেশকে পুরোপুরি সরিয়ে নিয়ে আসেন। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক যথেষ্ট খারাপ হয়ে যায়। মাহবুব আলম চাষী মুশতাকের নির্দেশ মত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন যে, বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পদ ভাগ এবং বিহারীদের প্রত্যাবর্তন নিয়ে দেনদরবারে আগ্রহী নয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির জন্য এ ছিল বিরাট চপেটাঘাত। বাংলাদেশ তখন ঐ দু'টি অতি প্রয়োজনীয় দাবি আদায়ের বিষয়ে অত্যন্ত সুবিধাজনক স্থানে ছিল। এভাবে ক্ষমতায় থাকার তিন মাসে মুশতাক সরকার বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী বিভিন্ন কাণ্ড করেছে। বাংলাদেশ পশ্চিমা প্রভাবিত একটি দেশে পরিণত হয়।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশাররফ এক পাল্টা ক্যু এর মাধ্যমে মুশতাককে হটিয়ে দেন। কিন্তু ৭ নভেম্বরেই তিনি কর্নেল তাহেরের সৃষ্ট সিপাহী বিদ্রোহে ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন। তাহেরের শুরু করা বিদ্রোহে নায়ক হিসেবে শেষে উত্থান ঘটে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের।

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি

'৭৫ সালের নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং পরবর্তী সময়ের একাধিক ক্যু পাল্টা ক্যু-এর পর তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসীন হন। জিয়াউর রহমান সরকার গঠনের পর যে পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করেন, সেটি মুজিব সরকারের পররাষ্ট্র নীতি থেকে অনেক ভিন্ন। এখানে উল্লেখ্য, জিয়াউর রহমান যে ধারার পররাষ্ট্র নীতিকে পূর্ণতা দেন, তার সূত্রপাত খন্দকার মুশতাকের সময়ে। জিয়া সরকারের পররাষ্ট্র নীতির যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, তা হচ্ছে, চীন ও পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলোর সঙ্গে সু-সম্পর্ক। মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব ঘনিষ্ঠ করা এবং বিশ্ব শান্তির উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কাজ করা। এর বাইরে সব থেকে বড় নীতিটি ছিল অর্থনৈতিক কূটনীতি অনুসরণ। অর্থনৈতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে জিয়া সরকার ও পূর্ববর্তী মুজিব সরকারের নীতিগত মিল ছিল।

সেনা শাসন জারী এবং শেখ মুজিবের মত মহান ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্বে দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছিল। জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহণ করে দেশের ভাবমূর্তি উদ্ধার এবং সময়োপযোগী পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণের উদ্যোগ নেন। মুজিব নিহত হবার পর ভারত এবং তার সমাজতান্ত্রিক মিত্ররা বাংলাদেশের ওপর অত্যন্ত নাখোশ ছিল। তাছাড়া অর্থনৈতিক কারণে পুঁজিবাদী দেশ ও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সাহায্য বাংলাদেশের জন্য খুব-ই জরুরী ছিল। মুজিব সরকার-ই তার শাসনামলের শেষ দিকে বিষয়টি অনুধাবন করে তার পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন আনার প্রয়াস চালাচ্ছিলেন। তবে তিনি দু'পক্ষের ভেতর একটি ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তা ছিল অসম্ভব। সবদিক বিবেচনা করে নতুন সরকার পশ্চিমা পুঁজিবাদীদের দিকে ঝুঁকে যাওয়াকে সুবিধাজনক ভেবেছিলেন। পরবর্তী সময়ের পররাষ্ট্র নীতিতে এবং চিন্তায় এর প্রতিফলন দেখা গেছে।

সব সময়ের জন্যই বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির একটি প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে শুরু করে ১৫ আগস্ট শেখ মুজিব নিহত হবার পূর্ব পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এককথায় ছিল চমৎকার। অবশ্য '৭৪ সালের গ্রীষ্মকালের দিক থেকে মুজিব সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কিছুটা শীতল হয়েছিল। যদিও তার সঙ্গে জিয়ার সরকারের সাথে ভারতের সম্পর্কের তুলনা চলে না। জিয়ার আমলে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক ছিল স্মরণকালের সর্বাপেক্ষা খারাপ। কিন্তু তারপরও ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন, ক্ষমতা, জনসংখ্যা সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির জন্য ভারত খুব-ই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং জিয়া সরকারকে ভারতের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হয়েছিল।

www.pathagar.com

'৭০ দশকে, অর্থাৎ জিয়ার শাসনামলে অন্তত তিনটি প্রধান সমস্যা ভারতের সঙ্গে বিরাজমান ছিল। এগুলো হচ্ছে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন, সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতের হস্তক্ষেপ। মোটা দাগে চিহ্নিত এসব সমস্যার বাইরে আরো অনেক সমস্যা বিদ্যমান ছিল। সেগুলোও সময়ে সময়ে দু'দেশের সম্পর্কের নীতি নির্ধারক হয়ে উঠেছে।

গঙ্গা নদী তথা ফারাক্কার কারণে বাংলাদেশের পদ্মা নদীর উজানে পানি প্রত্যাহারের কারণে দেশের বিপুল ক্ষতি হচ্ছিল। বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলির একটি হচ্ছে পদ্মা। এর অসংখ্য শাখ নদী উপ-নদীর মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডের অনেকটা জুড়ে পানি প্রবাহের কাজ পদ্মা করে থাকে। এ নদীর সুষ্ঠু পানি প্রবাহের সঙ্গে জড়িত কৃষিকাজ, বিদ্যুৎ উৎপাদনের একাংশ, বন, মৎস সম্পদ, নৌ-পরিবহন সহ হাজারো বিষয়। শুধু এক পদ্মার পানি প্রত্যাহার-ই বাংলাদেশের জন্য বড় বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। তার নমূনা দেখাও গেছে।

শুধু ১৯৭৫-৭৬ অর্থ-বছরেই বাংলাদেশের শিল্প ক্ষেত্রে গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের কারণে লোকসান ছিল প্রায় ১১৭ মিলিয়ন টাকা। কৃষিকার্যে ঐ সময় দেশের ৭৫ ভাগ শ্রম নিয়োগ করা ছিল। দেশের মোট জিডিপির ৫৬ ভাগ আসত কৃষি খাত থেকে। '৭৬ সালে শুধু ধানের ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ৩৬ হাজার টন। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। গঙ্গার তথা পদ্মার পানি প্রত্যাহারের ফলে এর শাখা-নদী-উপনদীর পানি দারুণভাবে হ্রাস পাওয়ায় সেচ কার্যে যেমন ক্ষতি হয়, তেমনি নৌ-পরিবহন বাধাগ্রস্ত হয় দারুণভাবে। বলাবাহুল্য, ঐ সময়ে দেশের প্রধান পরিবহন মাধ্যম ছিল নৌ-পথ। সুতরাং শুধু ফারাক্কায় পদ্মার পানি প্রত্যাহারের কারণে বাংলাদেশ যে বিপুল ক্ষতির শিকার হয়, তাতে তার দ্রুত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা ছাড়া গতি ছিল না। ফারাক্কার প্রভাব বাংলাদেশের জন জীবনেও প্রভাব বিস্তার করে; যা দৃশ্যমান ছিল। ফলে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষও ভারত বিরোধী হয়ে ওঠে। মানুষের প্রতিক্রিয়া বোঝা যায় মাওলানা ভাসানীর ফারাক্কা লং মার্চের ব্যাপক জনসমাগম ও সফলতার ভেতর দিয়ে। বাংলাদেশের পানির অভাব এবং জনগণের দুরাবস্থা দেখে অশীতিপর বৃদ্ধ নেতা মাওলানা ভাসানী ইন্দিরা গান্ধীর নিকট চিঠি লেখেন। চিঠির যে উত্তর মিসেস গান্ধী প্রদান করেন, তাতে সন্তুষ্ট না হতে পেরে আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আবারও পত্র দেন ইন্দিরাকে। তিনি ভারতীয় জনতার কাছে বাঁধ ভেঙে ফেলারও আবেদন জানান। বিশ্বকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি জানানোর উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালের ১৬ মে রাজশাহী থেকে ফারাক্কা অভিমুখে লংমার্চের নেতৃত্ব দেন তিনি। লংমার্চের ফলে ফারাক্কা সমস্যার প্রতি দেশে-বিদেশে দারুণভাবে সবার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।

www.pathagar.com

১৯৭৫ সালের এপ্রিলে মুজিব সরকারের সঙ্গে ভারতের পানি বণ্টন নিয়ে যে সমঝোতা হয়, তার ভিত্তিতে ১৯৭৬ সালের গোড়া থেকেই বাংলাদেশ স্থায়ী চুক্তির দাবি উত্থাপন করে। কিন্তু ভারত তাতে মোটেই কর্ণপাত করছিল না। ১৫ জানুয়ারী ১৯৭৫ এবং এক-ই বছরের ৩ ফেব্রুয়ারি দু'বার বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একতরফা পানি প্রত্যাহারের প্রতিবাদ জানানো হয় ভারতের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে। বিভিন্ন বিবৃতিও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, ১৯৭৫ সালের এপ্রিলে সমঝোতার মাত্র ক'মাসের ভেতর ভারত একতরফা পানি প্রত্যাহার কেন শুরু করল বা কেনই বা ফারাক্কা নিয়ে কোন সমঝোতায় আসতে রাজী হচ্ছিল না এর উত্তর খুব কঠিন নয়। ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হবার পর বাংলাদেশের রাজনীতি এবং পররাষ্ট্র নীতিতে যে গুণগত পরিবর্তন আসে, তাতে ভারত বাংলাদেশের বৈরী হয়ে পড়ে। নতুন প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শক্ত অবস্থান নেয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

১৯৭৬ সালের মে মাসে ইস্তাম্বুলের ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মলনে ফারাক্কা সমস্যা উত্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সমস্যাটির আন্তর্জাতিকীকরণের উদ্যোগ নেয়। ১৯৭৬ সালের আগস্টে কলম্বোর জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনেও প্রশ্নটি তোলা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ৩১তম অধিবেশনে ফারাক্কা সমস্যা উত্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। সে মত, প্রথা অনুসারে ২১ আগস্ট বাংলাদেশ বিষয়টি আলোচনার আবেদন জানিয়ে নোটিশ দেয়। নোটিশের শিরোনাম ছিল 'ভারতের একতরফা গঙ্গা পানি প্রত্যাহারের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি'। বিভিন্ন কমিটিতে আলোচনা এবং বাদপ্রতিবাদের পর বিষয়টি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। ভারত এবং রাশিয়াসহ তার সমাজতান্ত্রিক মিত্ররা বিষয়টির তীব্র বিরোধিতা করা সত্ত্বেও বাংলাদেশের কৌশলী নীতির কারণে তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। বাংলাদেশের মত একটি দুর্বল নবীন দেশের ভারতের মত প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এ ছিল বিরাট কূটনৈতিক বিজয়। ২০ নভেম্বর ১৯৭৬ জাতিসংঘ দু'দেশের ঐকমত্যের পরামর্শ দিয়ে একটি সিদ্ধান্ত নেয়। এ বিষয়ের অগ্রগতি জানাতে বলা হয় ৩২তম অধিবেশনে। ফারাক্কা প্রশ্নে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বাংলাদেশের পক্ষ নেয়া দেশের কূটনীতির জন্য বিরাট বিজয় ছিল।

১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে ভারতীয় সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী পরাজিত হন। মোরারজী দেশাই সরকার গঠন করেন। তার সরকারের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ১৯৭৭ সালের ৩০ সেপ্টম্বর দিল্লিতে ফারাক্কা প্রশ্নে একটি চুক্তি হয়। পরে ৫ নভেম্বর '৭৭ সালে ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়।

www.pathagar.com

চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ-ভারতের ভেতর প্রতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত পানি বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। এটিই হচ্ছে শুষ্ক মৌসুম। বছরের অন্য সময়ে নদীতে যে পানি প্রবাহ থাকে, তাতে সমস্যা হয় না। বন্টিত পানির হিসাব ছিল নিম্নরূপ—

সময়	ফারাক্কায় পানি প্রবাহ (১৯৪৮-৭৩ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা তথ্যের ৭৫ শতাংশ নির্ভরযোগ্য ভিত্তিতে কিউসেক	ভারতের প্রাপ্য কিউসেক	বাংলাদেশের প্রাপ্য কিউসেক
জানুয়ারি			
১-১০	৯৮,৫০০	৪০,০০০	৫৮,৫০০
১১-২০	৮৯,৭৫০	৩৮,৫০০	৫১২৫০
২১-৩১	৮২,৫০০	৩৫,০০০	৪৭৫০০
ফেব্রুয়ারি			
১-১০	৭৯,২৫০	৩৩,০০০	৪৬,২৫০
১১-২০	৭৪,০০০	৩১,৫০০	৪২,৫০০
২১-২৮/২৯	৭০,০০০	৩০,৭৫০	৩৯,২৫০
মার্চ			
১-১০	৬৫,২৫০	২৬৭৫০	৩৯,২৫০
১১-২০	৬৩,৫০০	২৫,৫০০	৩৮,০০০
২১-৩১	৬১,০০০	২৫,০০০	৩৬,০০০
এপ্রিল			
১-১০	৫৯,০০০	২৪,০০০	৩৫,০০০
১১-২০	৫৫,৫০০	২০,৭৫০	৩৪,৭৫০
২১-৩০	৫৫,০০০	২০,৫০০	৩৪,৫০০
মে			
১-১০	৫৬,০০০	২১,৫০০	৩৫,০০০
১১-২০	৫৯,২৫০	২৪,০০০	৩৫,২০০
২১-৩১	৬৫,৫০০	২৬,৭৫০	৩৮,৭৫০

সূত্রঃ ফারাক্কা ব্যারাজ ও বাংলাদেশ, বি. এম. আব্বাস এ টি

ফারাক্কা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে চুক্তির ৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে একটি যৌথ নদী কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন তথ্যউপাত্ত বিশ্লেষণের পর দু'দেশের পক্ষ থেকে দু'টি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ২৫ মার্চ ১৯৭৮ সালে ঢাকায় প্রস্তাব দু'টি আদানপ্রদান করা হয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ তার প্রস্তাবে নেপালে ড্যাম নির্মাণ করে শুষ্ক মৌসুমের জন্য অতিরিক্ত পানি জমিয়ে রাখার প্রস্তাব দেয়। এক-ই ড্যাম ভারতেও নির্মানের কথা বলা হয়। এর জন্য নেপালের অংশগ্রহণের প্রশ্ন ছিল। ভারত নেপালের অংশগ্রহণের বিরোধিতা করছিল। ভারতীয় প্রস্তাবে তারা ব্রহ্মপুত্র থেকে খাল কেটে পানির অতিরিক্ত প্রবাহ গঙ্গায় আনার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু খালের একটা বড় অংশই যাবে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে। কৌশলগত এবং বাস্তব কারণে এ প্রস্তাব বাংলাদেশের পক্ষে মানা সম্ভব ছিল না। সুতরাং বাংলাদেশ ভারতীয় প্রস্তাব নাকচ করে দেয়।

জিয়া সরকারের সময় স্বাক্ষরিত চুক্তির কারণে বছর পাঁচেক ফারাক্কা সমস্যা নিয়ে বিশেষ হৈ-চৈ হয়নি। কিন্তু তারপর আবার এ নিয়ে বাংলাদেশভারত সম্পর্কের টানাপড়েন শুরু হয়। শেখ হাসিনা সরকারের সময় ৩০ বছর মেয়াদী চুক্তির পূর্ব পর্যন্ত এ ঝামেলা লেগেই ছিল। সেসব প্রসঙ্গ পরে আসবে অন্য অধ্যায়ে। জিয়া সরকারের সময়ে পাঁচ বছর মেয়াদী চুক্তিটিই ছিল সমস্যার আপাত সমাধান।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা ছিল দু-দেশের সীমান্ত চিহ্নিত করার বিষয়। ১৯৭৪ সালের ১৬ মে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির মাধ্যমে বিষয়টি সমাধানের দিকে গড়ালেও ১৫ আগস্টে হত্যাকাণ্ড পরিস্থিতির ভিন্ন রূপদান করে। সঠিকভাবে সর্বত্র সীমানা চিহ্নিত না হওয়া এবং দু'প্রতিবেশীর সম্পর্ক খারাপ হয়ে পড়ায় সীমান্তরক্ষীদের ভেতর সংঘর্ষ যেমন নিয়মিত হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি চোরাচালন নিয়ন্ত্রণও অসম্ভব হয়ে পড়ে। সীমান্ত নিয়ে সমস্যা দিন দিন দু'দেশের সম্পর্ক আরো তিক্ত করে ফেলে। ১৯৭৯ সালের নভেম্বরে মুহুরী নদীর ৫০ একর চরে চাষ নিয়ে দু'দেশের সীমান্তরক্ষীদের বিবাদ পরিস্থিতির একটা চিত্র। এ সমস্যার সমাধান বাংলাদেশের জন্য বিশেষ জরুরী হলেও জিয়া সরকার বিষয়টি নিয়ে তেমন কিছুই করতে পারে নি।

সীমান্ত চিহ্নিতকরণ সমস্যা শেষ পর্যন্ত সমুদ্রসীমা নিয়ে জটিলতার উদ্ভব ঘটায়। দু'দেশের ভেতর অনেক আলাপআলোচনার পরও সমস্যার সমাধান হয়নি। সমুদ্র সীমা নিয়ে জটিলতার নমুনা প্রকাশ পায় দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের অধিকার নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের তীব্র মতবিরোধের ভেতর। ১৯৭১ সালে দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত হন, দ্বীপটি বাংলাদেশর সীমানার ভেতর। হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় বঙ্গোপসাগরের নিকট ২৪ কিঃ মিঃ লম্বা ও ১২ কিঃ মি চওড়া দ্বীপটির অবস্থান। জিয়া সরকারের সময় তীব্র বাদানুবাদের পরও কোন সমাধান হয়নি। ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই বাংলাদেশ সফরকালে দ্বীপটির বিষয়ে একটি যৌথ সার্ভের কথা মেনে নিয়েছিলেন। এর

www.pathagar.com

মাধ্যমে দ্বীপটির মালিকানা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী সরকার গঠন করেই এক তরফাভাবে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়ান। ১৯৮১ সালের ৯ মে ভারতীয় নৌবাহিনী দক্ষিণ তালপট্টি দখল করে নেয়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো সত্ত্বেও কোন ফল উদয় হয়নি। উল্টো ভারত বাংলাদেশকে দায়ী করে প্ররোচনাদানের জন্য। দেশের বিরোধী দলগুলো জিয়া সরকারকে তালপট্টি নিয়ে নতজানু নীতির জন্য সমালোচনা করেছিল।

জিয়া সরকারের সময় একটি বড় দ্বিপাক্ষিক সমস্যা ছিল চাকমা সমস্যা। ভারতীয় সরকার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চাকমা বিদ্রোহীদের নিয়মিত সাহায্য দিত। বাংলাদেশ ঐ সময় বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা চালিয়েও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি।

কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন একটি সশস্ত্র সংগঠনকে ভারত সাহায্য যোগাচ্ছিল। তারা ১৫ আগস্টের পর ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল শেখ মুজিব হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। এ বাহিনীর তৎপরতায় দেশের সীমান্ত এলাকায় বেশ কিছু ক্ষতি হতাহতের ঘটনা ঘটে। ১৯৭৭ সালের মার্চে ইন্দিরা সরকারের পরাজয়ের পর দেশাই সরকারের সঙ্গে জিয়া সরকারের সমঝোতার ভিত্তিতে কাদের বাহিনীর তৎপরতা বন্ধ হয়। '৮০ সালে ইন্দিরা আবার সরকার গঠনের পর এদের তৎপরতার আশঙ্কা করা হলেও পররাষ্ট্রমন্ত্রী নরসীমা রাও বাংলাদেশে এলে তার সঙ্গে একটি বোঝাপড়া সম্ভব হয়। বাংলাদেশ কৌশলের সঙ্গে সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিল। অন্যথায় পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা সমস্যার মত এটিও দীর্ঘস্থায়ী সমস্যায় পরিণত হতে পারত।

১৯৭৭ সালের মার্চে ইন্দিরা সরকারের পতনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশভারত সম্পর্ক কার্যত অচলাবস্থার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। নির্বাচনে জিতে মোরারজী দেশাই সরকার গঠনের পর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য বাংলাদেশের তাগাদা বেশি ছিল বোধগম্য কারণেই। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে জিয়াউর রহমান নেপাল থেকে ভারত যান। বিমান বন্দরে প্রেসিডেন্ট সঞ্জিবা রেড্ডি এবং প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই তাকে স্বাগত জানান। পুরো সফরটিই ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। এতে সম্পর্কের অনেকটা উন্নতি হয়। দেশাই ফিরতি সফরে আসেন ১৯৭৯ সালের এপ্রিলে। কূটনৈতিক দিক থেকে এ সফরও সফল ছিল। ইন্দিরা গান্ধী নতুন করে ৮০ সালে ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক অচল হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হলেও কার্যত তা হয়নি। উপরন্তু সম্পর্কের গতি দেশাই সরকারের পর্যায়েই ছিল। ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে ইউএনআইডিও-এর আমন্ত্রণে জিয়া এর দিল্লী সম্মেলনে যোগ দেন। ইন্দিরা গান্ধী এবং প্রেসিডেন্ট রেড্ডি তাকে দিল্লী বিমান বন্দরে স্বাগত জানান। সফর ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। এসব সফর ছাড়াও মন্ত্রী বা সচিব পর্যায়ে আরো অনেক সফর হয়েছে। কিন্তু সার্বিকভাবে

www.pathagar.com

জিয়ার সময় ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক শীতলই বলতে হবে। অনেক চেষ্টার পরও বেশিরভাগ প্রধান দ্বিপক্ষীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়নি। জাতিসংঘে বাংলাদেশের দক্ষ কূটনৈতিক তৎপতার ফল স্বরূপ ৫ বছর মেয়াদী পানি চুক্তিটি ভারতের সঙ্গে সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়া অগ্রগতি সামান্যই।

জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি থাকার সময় বার্মা (অধুনা-মায়ানমার)-বাংলাদেশ সম্পর্কে দারুণ জটিলতা সৃষ্টি হয়। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে হঠাৎ করে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা শরনার্থী বাংলাদেশে আসতে শুরু করে। জুন মাসের ভেতর প্রায় দু'লক্ষাধিক শরনার্থী এসে আশ্রয় নেয়। তেরটি উদ্বাস্তু শিবির তৈরি করে তাদের রাখা হয়। শরনার্থীদের সবাই ছিল মুসলিম। অনুসন্ধান করে জানা যায়, মায়ানমার কর্তৃপক্ষ আরাকান অঞ্চলে অবৈধ অভিবাসী শনাক্ত করার জন্য সার্ভে করতে গিয়ে অপারেশন ড্রাগন' নামের অভিযান চালিয়ে ব্যাপক অত্যাচার শুরু করার ফলে এ অবস্থা। অবৈধ অধিবাসী তাড়ানোর নামে কার্যত সকল মুসলিম অধিবাসীদের উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু হয়। বাংলাদেশ-মায়ানমারের যে ২৩৩ কিঃ মিঃ সীমান্ত আছে, সেই বরাবর আরাকানের অবস্থান হওয়ায় শরনার্থী সব বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে শুরু করেছিল।

বাংলাদেশের পক্ষে এ বিপুল শরনার্থী সামাল দেয়া সম্ভব ছিল না। তারা বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাহায্য কামনা করলে ইউএনএইচসিআর-এর মাধ্যমে সাহায্য আসতে থাকে। প্রায় ১৫.৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ঐতিহাসিক আমল থেকেই আরাকান এবং বাংলাদেশের ভেতর যাতায়াত, বিবাহ প্রভৃতি চালু থাকায় শরনার্থীদের সঙ্গে বাঙ্গালীদের পার্থক্য করা খুব-ই মুশকিল ছিল। ফলে মায়ানমার কর্তৃপক্ষ দাবি করছিল, বাংলাদেশ থেকে অনেক মানুষ আরাকানে অবৈধ অভিবাসী হয়েছে।

বাংলাদেশের জন্য শরনার্থীদের দেশে পাঠানো খুব-ই জরুরী ছিল। কিন্তু তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ও তার প্রশাসন মায়ানমারের আন্তরিকতার বিষয়ে হতাশ ছিলেন। শেষ পর্যন্ত একটি চুক্তি সম্ভব হয়। ১৯৭৮ সালের ৩১আগস্টের মধ্যে শরনার্থীদের প্রত্যাবর্তন শুরুর কথা বলা হয়। সে মত কাজও শুরু হয়। ইউএনএইচসিআর পূনর্বাসনের জন্য মায়ানমার সরকারকে সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ নেয়। পুনর্বাসনের জন্য শরনার্থীদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হ,য়— এ, বি, সি। মায়ানমার সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জাতীয় নিবন্ধন সনদ যাদের আছে, তারা 'এ' শ্রেণীর। 'বি' শ্রেণীর হচ্ছে, যারা মায়ানমারের নাগরিক মর্মে কোন প্রমাণ দেখাতে পারবে তারা, আর বাকীরা 'সি' শ্রেণীর। এ প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া চলছিল অত্যন্ত ধীরগতিতে।

www.pathagar.com

১৯৭৯ সালের মে মাসে নে উইন, মায়ানমারের রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশ সফরে আসেন। তার সফরকালে দু'দেশের ভেতর সীমানা চিহ্নিতকরণ চুক্তি হয় ২৩ মে। দু'দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা এতে স্বাক্ষর করেন। জিয়া সরকারের শেষদিকে নে উইন এবং জিয়া পাল্ট পাল্টি সফর করেছেন। এ সফরের বাইরে মন্ত্রী এবং কর্মকর্তাদের ভেতর আরো সফর হয়েছিল। বাংলাদেশ মায়ানমারের সাথে সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত মোটামুটি একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনতে পেরেছিল।

মুসলিম বিশ্ব তথা আরব বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রশ্নটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মুজিব সরকারও বিষয়টিকে এমন দৃষ্টিতেই দেখছিলেন। তবে তার কিছু সমস্যা ছিল মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে। তারপরও তার সরকার এক্ষেত্রে অনেকখানি এগিয়ে ছিলেন। প্রসঙ্গটি আগেই বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। জিয়া সরকার আরো ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। সে ক্ষেত্রে তার কিছু সুবিধাও ছিল। ১৫ আগষ্ঠের পর মুশতাক ভারত-সোভিয়েত অক্ষ থেকে বেরিয়ে পাকিস্তান ও পশ্চিমা দেশগুলোর নিকটবর্তী হওয়ার উদ্যোগ নেন। এতে সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো বাংলাদেশের প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে। জিয়া সরকার পররাষ্ট্রনীতির ঐ ধারাটিকেই পরিশীলিত রূপ দান করেন। মুশতাক সরকার সম্পত্তির ভাগাভাগি সহ বিভিন্ন বিষয়ে পাকিস্তানকে যতটা ছাড় দেন, তা ছিল দারুনভাবে বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী। জিয়া সরকারও বিষয়গুলো নিয়ে কার্যকর কোন উদ্যোগ নেননি, এমন অভিযোগ আছে।

জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালের জুলাইতে সৌদি আরব সফর করেন। ১৯৮১ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জিয়া নিরন্তরভাবে মুসলিম দেশগুলো সফর করেছেন। তার সফরের সঙ্গে এসব দেশের সম্পর্ক দিন দিন ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের ধনী দেশগুলো দিন দিন বাংলাদেশের দিকে সাহায্যের হাত বেশি পরিমাণে প্রসারিত করছিল। মধপ্রাচ্যের ফিলিস্তিন সমস্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ছিল আরবদের একনিষ্ঠ সমর্থক। ওআইসিতেও বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল ইতিবাচক। জিয়া সরকারের সঙ্গে ভারত-সোভিয়েত অক্ষের বৈরিতা এবং পুঁজিবাদীদের সু-সম্পর্ক তার মধ্যপ্রাচ্য নীতির সহায়ক ছিল। মধ্যপ্রাচ্যে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নিজস্ব প্রয়োজন-ই ছিল মুখ্য। অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কথাও জিয়া সরকার এক্ষেত্রে মনে রেখেছিলেন। ১৯৭৭ সালে প্রথমে সৌদি আরবে যাবার পরিষ্কার উদ্দেশ্য ছিল অভ্যন্তরীণ রাজনীতি। দেশের ধর্মভীরু মানুষ সৌদি আরবকে ধর্মীয় কারণে মর্যাদার চোখে দেখে থাকে। সুতরাং সে দুর্বলতাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য ঐ সফরে ছিল।

মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার জন্য জিয়া সরকার কিছু পদক্ষেপ নেন। পাকিস্তানের সঙ্গে মুশতাকের শুরু করা ঘনিষ্ঠতা জিয়া বহাল

www.pathagar.com

রাখেন। ভারত-সোভিয়েত অক্ষ বিরোধী পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা শুরু করা হয়। সংবিধানের মূল চার নীতি বদলে ফেলা হয়। বিশেষ করে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরক্ষেপতা বাদ দিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আল্লাহর প্রতি অসীম আস্থা সংবিধানে জুড়ে দেয়া হয়। 'বিসমিল্লাহহির রাহমানের রাহিম' যোগ করা হয়। সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদে যেখানে দেশের বিদেশ নীতির প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, সেখানে নতুন ধারা যোগ করা হয় মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে।

এসব পরিবর্তনের ফলও বাংলাদেশ পেয়েছিল। মুসলিম বিশ্বে ঐ সময় বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭৮ সালে ডাকারের ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন থেকে বাংলাদেশ মুসলিম দেশগুলোর সমর্থন পায় নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পদের জন্য। বাংলাদেশ আলকুদ্‌স কমিটির সদস্য পদ, ইসলামিক সলিডারিটি ফান্ডের স্থায়ী সদস্যপদ, ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধের জন্য গঠিত ওআইসি প্রতিনিধিদলের সদস্য পদ প্রভৃতি লাভ করেছিল।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে সেখানে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ দারুণভাবে বেড়ে যায়। বাংলাদেশ সম্পর্ক এমন পর্যায়ে নিতে সক্ষম হয় যে, ৭৫-৭৬ সালের ৭৬৪ মিলিয়ন টাকা সাহায্য '৮০ দশকের শুরুতে প্রায় চার হাজার মিলিয়নে দাঁড়ায়। দাতা ছিল ১৯টি আরব দেশ ও ইরান। শুধু সৌদি আরবের সাহায্য ৭১-৭৫ সালের তুলনায় ৭৬-৮২ সময়কালে ১০ মিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ৫৫৪১.৮ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছিল।

সুতরাং জিয়া সরকারের মধ্যপ্রাচ্য নীতি বলাবাহুল্য যথেষ্ট সফল ছিল।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে জিয়া সরকারের নীতি ছিল দু'ভাগে বিভক্ত। একভাগে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রদের সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক। অন্যদিকে চীনের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এ সমীকরণ জিয়া সরকারের আমলের। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার সমাজতান্ত্রিক মিত্ররা পক্ষে ছিল; আর চীন ছিল চূড়ান্ত আকারে বৈরী। ফলে স্বাধীনতা উত্তর সময়ে মুজিব সরকারের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার মিত্রদের সম্পর্ক অনেক ভাল ছিল চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল খারাপ। এতটাই জটিল ছিল যে, জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের ক্ষেত্রে চীন তার ভেটো ক্ষমতা পর্যন্ত বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রয়োগ করেছিল। '৭৪ সাল নাগাদ অবস্থার পরিবর্তন হয়। এর নেপথ্যে ছিল মুখ্যত অর্থনৈতিক কারণ। ১৫ আগস্ট মুজিব হত্যাকাণ্ডের পর প্রেক্ষাপট আমূল বদল হয়ে যায়। জিয়া পররাষ্ট্র নীতি সম্পূর্ণ বদলে ফেলেন।

প্রয়োজনে বাংলাদেশ চীন ও সোভিয়েত পক্ষের ভেতর অধিকতর পশ্চিমাঘেঁষা ভারত বিরোধী সমাজতান্ত্রিক দেশ চীনকে বেছে নিয়েছিল। এর পেছনে পরিষ্কার দু'টি কারণ চিহ্নিত করা যায়। প্রথমতঃ সামরিক সরকারের গ্রহণযোগ্যতা ও

www.pathagar.com

নিরাপত্তা আন্তর্জাতিকভাবে নিশ্চিত করা, দ্বিতীয়তঃ আঞ্চলিক রাজনীতিতে দেশের নিরাপত্তা নিশ্চত তথা 'পাওয়ার' ব্যালান্সের প্রয়াস এবং দেশের সেনাবাহিনীর অস্ত্র ও রসদ সংগ্রহের সুযোগ নিশ্চিত করা। চীনের সঙ্গে সু-সম্পর্ক পশ্চিমা পুঁজিবাদীদের সঙ্গে সম্পর্কের অনুকূল ছিল।

১৯৭৬ সালের গোড়াতেই জিয়া চীন সফরে যান। জিয়ার সেই সফর চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের নতুন যুগের সূত্রপাত করে। ১৯৮০ সালের আগস্টে জিয়া আবার চীন সফরে যান। তখন তিনি বাংলাদেশের সোভিয়েত বিরোধী অবস্থান স্পষ্ট করেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এ সময় বাংলাদেশী অবস্থান এবং চৈনিক অবস্থানের ভেতর মিল ছিল। প্রায় প্রতিটি আন্তর্জাতিক ইস্যুতে তারা একমত পোষণ করছিল। চীনের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হয়েছিল। যেখানে মুজিব আমলে চৈনিক সাহায্য ছিল নগণ্য, সেখানে জিয়ার আমলে তার পরিমাণ ছিল প্রায় ৭ মিলিয়ন ডলারের মত।

চীন-বাংলাদেশের এ সখ্যতা সোভিয়েত ইউনিয়ন মোটেও ভালভাবে নেয়নি। অবশ্য বাংলাদেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গেও স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বিভিন্ন ইস্যুতে তার অবস্থান সম্পর্ক বজায় রাখার অনুকূল ছিল না। বাংলাদেশ আফগানস্তানে সোভিয়েত হামলার তীব্র সমালোচনাই শুধু করেনি, এক-ই সঙ্গে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনও আহ্বান করে। কাম্পুচিয়া প্রশ্নেও বাংলাদেশের অবস্থান ছিল সোভিয়েত অবস্থানের বিপরীতে। এমনি উদাহরণ আরো আছে।

পুঁজিবাদী দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্থাপনের সক্রিয় প্রয়াস শুরু হয় মুজিব আমলের শেষদিক থেকে। জিয়া সরকার ঐ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় বলা যায় আরো দ্রুততার সঙ্গে দেশকে একটি পুঁজিবাদী প্রভাবিত দেশে পরিণত করেন। বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ, যার বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া চলার উপায় নেই, তার পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলোর নিকট থেকে সাহায্য অত্যন্ত জরুরী। মুজিব সরকারও এ সত্য অনুধাবন করেছিলেন। পুঁজিবাদি দেশগুলোর নেতৃত্বে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। জিয়া সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। অর্থনৈতিক প্রয়োজনের পাশাপাশি জিয়া সরকারের স্বীকৃতি দেশের নিরাপত্তা প্রভৃতি কারণেও মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমাদের দিকে ঝুঁকতে হয়েছিল। ঐ সময় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো এক পরাশক্তির সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হলে অন্যটির দিকে ঝুঁকত।

পশ্চিমা দেশগুলো বিপুল সাহায্য জিয়ার সময়ে বাংলাদেশকে দিয়েছে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রই '৭৬-'৭৮ সালের ভেতর দিয়েছিল ৭৩৫ (প্রায়) মিলিয়ন ডলার। জাপান যুক্তরাজ্য সহ অন্যেরা তো ছিলই। বাংলাদেশের বাণিজ্যও এ সময় বেড়ে যায় কয়েকগুন।

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্র বা তার মিত্রদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল সমান্তরাল। বাংলাদেশ ১৯৭৯ সালে পারমাণবিক অস্ত্র সীমিতকরণ (NPT) চুক্তি স্বাক্ষর করে। উদার অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে জিয়া দেশে পশ্চিমা পুঁজি বিনিয়োগ সহজ করে দেন। দু'-একটি ক্ষেত্রে মৃদু মতপার্থক্য যে হয়নি তা নয়, তবে তা সমস্যা করতে পারেনি।

আঞ্চলিক রাজনীতির ক্ষেত্রে জিয়া সরকার সচেতন ছিলেন। তার বড় নমুনা হচ্ছে সার্কের মত একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া। ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর এরশাদ সরকারের আমলে সার্কের প্রথম আনুষ্ঠানিক সম্মেলন হলেও এর প্রকৃত উদ্যোক্তা ছিলেন জিয়া। ১৯৮০ সালের ২ মে ব্যক্তিগত প্রতিনিধির মাধ্যমে সার্কের বর্তমান সদস্য দেশগুলোর সরকার প্রধানদের নিকট তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এমনি একটি সংগঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

জিয়া সরকারের সময় বাংলাদেশ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত হয় যে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো যদি একটি আঞ্চলিক সংস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয় তবে এ অঞ্চলের মানুষের ভাগ্য ফিরে যাবে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিপুল উন্নতি সম্ভব। দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর ভেতর সম্পর্কের যে টানাপড়েন এবং সহযোগিতার যে অভাব বিদ্যমান, তার গতিটাই বদলে দেয়া সম্ভব একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার মাধ্যমে। জিয়া বিভিন্ন সংস্থার ফোরাম থেকে তার অভিজ্ঞতা নিয়েছেন। অবশেষে ১৯৮০ সালের মে মাসে চিঠি প্রদানের মাধ্যমে একটা প্রস্তাব সবার কাছে পাঠান। অবশ্য এর আগে বিভিন্ন সাক্ষাতে আঞ্চলিক নেতাদের নিকট অনানুষ্ঠানিক আলাপও হয়েছে।

১৯৮০ সালে ইউএনজি এ মিটিং-এ ৭ দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা এ মর্মে মত পোষণ করেন যে, একটি ওয়ার্কিং পেপার তৈরি করা প্রয়োজন। সেটি বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তৈরি করে ২৫ নভেম্বর ১৯৮০ সংশ্লিষ্টদের নিকট পাঠান। ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নতুন দিল্লির জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের সময় অনানুষ্ঠানিকভাবে ৭ দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা সিদ্ধান্ত নেন, কলম্বোতে ৭ দেশের পররাষ্ট্র সচিবরা একটি আনুষ্ঠানিক বৈঠকের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করবেন। সার্ক সংগঠনের এ পর্যায়ে জিয়া নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। কিন্তু সার্ক গঠনের প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। ১৯৮৫ সালে ঢাকায় এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

আঞ্চলিক রাজনীতির ক্ষেত্রে জিয়ার সমস্যা ছিল ভারতের সঙ্গে, সেটি আগেই আলোচিত হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। ১৯৭৭ সালের ২১-২৩ ডিসেম্বর ২দিন ব্যাপী সফরের মাধ্যমে জিয়া সরকারের সঙ্গে পাকিস্তানের সেনা শাসক জিয়াউল হক সরকারের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। শেষ পর্যন্ত তা বহাল ছিল। সম্পদ ভাগাভাগি আটকে পড়া পাকিস্তানীদের প্রত্যার্পণ প্রভৃতি

www.pathagar.com

বিষয়ের কোন সমাধান জিয়া সরকার করতে পারেন নি। অন্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল গতানুগতিক।

জিয়া সরকারের সময় বাংলাদেশের একটি বড় অর্জন ছিল নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পদে নির্বাচিত হওয়া। ১৯৭৮ সালের ১০ নভেম্বর বাংলাদেশ জাপানকে পরাজিত করে ঐ পদে আসীন হয়। একটি নবীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য এটি বড় অর্জন ছিল। মুসলিম দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশসমূহ এবং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য দেশগুলির সক্রিয় সহযোগিতায় বাংলাদেশ ঐ পদে নির্বাচিত হতে সক্ষম হয়। ১৯৭৭ সালে জাপানকে কৌশলে বাংলাদেশের প্রার্থিতা আগে জানিয়ে দেয়ার ফলে জাপান বাংলাদেশকে তার পক্ষে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের বিষয়ে চাপ দিতে পারেনি। উল্টো নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নির্বাচনের সময় ১৪৯ ভোটের ভেতর দু'দফা বাংলাদেশের নিকট ৮৪-৬৫ এবং ৮৭-৬১ ভোটে হেরে তৃতীয় দফা নির্বাচনের আগেই প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেয়। তবে দু'দেশের এ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলেনি।

১৯৮১ সালের মে মাসে জিয়াউর রহমান নিহত হবার পর বিচারপতি আব্দুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন। পরবর্তীতে তিন মাসের ভেতর তিনি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। সাত্তার দেশ পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি। ১৫ আগস্টের পর থেকে সেনা শাসনের যে ভূত বাংলাদেশের ঘাড়ে চেপেছিল, তা আবার আবির্ভূত হয় সাত্তারকে সরিয়ে। সাত্তার জিয়ার নীতিতেই চলছিলেন। তিনি তেমন উল্লেখ করার মত কিছু করতে পারেন নি। তালপট্টি নিয়ে উত্তেজনা এবং চীনা প্রধানমন্ত্রীর সফর এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এরশাদ তার নিকট থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেন।

www.pathagar.com

এরশাদের পররাষ্ট্রনীতি

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ বাংলাদেশের তৎকালীন সেনাপ্রধান হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ রক্তপাতহীন এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে সরিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এরশাদ প্রথমদিকে শুধু সামরিক প্রধান থাকলেও অবিলম্বে রাষ্ট্রপতিও বনে যান।

এরশাদের পররাষ্ট্র নীতি মোটা দাগে জিয়া অনুসৃত নীতির-ই প্রতিফলন বলা যায়। এর কারণগুলো ছিল এক-ই রূপ। এরশাদ ক্ষমতা সংহত করার লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হন। এরশাদ ব্যতিক্রমী ছিলেন একটা স্থানে। সেটি হচ্ছে, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে। তার পূর্বসূরী জিয়ার আমলে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত খারাপ। কিন্তু এরশাদ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। এরশাদের পররাষ্ট্রনীতির কাঠামো বা সমীকরণ আগেই তৈরি হয়েছিল। এ সময়ের পরিস্থিতি ছিল অনেক স্থিতিশীল এবং দেশের অনুকূল। মুজিব বা জিয়া সরকারের মত জটিল অবস্থা এরশাদকে মোকাবেলা করতে হয়নি। জিয়া-মুজিব আমলে অনেক পরীক্ষা-নিরিক্ষার পর জিয়ার সময়ে পররাষ্ট্র নীতির যে নীতি-লক্ষ্য অনুসৃত হয়, তা ততদিনে স্থায়ী পররাষ্ট্র নীতিতে রূপ নিয়েছে। এরশাদ ঐ নীতিতেই অগ্রসর হয়েছেন। পরিবর্তন যৎসামান্যই।

এরশাদ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। এজন্য ক্ষমতা দখলের পর প্রথম বিদেশ সফরের জন্য তিনি ভারতকে বেছে নেন। কিন্তু বাংলাদেশের মূল পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে ভারতের প্রতি নীতির যথেষ্ট স্ব-বিরোধিতা বিদ্যমান ছিল। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভেতর চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বিষয় ছিল। শুধু তা-ই নয়, বৈশ্বিক নীতিটি এমন ছিল ে,যে তা বহাল রেখে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করা কঠিন ছিল। ভারত ছিল সোভিয়েত জোটে, বাংলাদেশ ছিল মার্কিন জোটে। সুতরাং এরশাদ ভারতের সঙ্গে এক রকম সম্পর্ক রক্ষায় সক্ষম হলেও দু'দেশের ভেতর বিদ্যমান সমস্যাগুলোর একটিরও জট খুলতে সক্ষম হননি।

ভারতের সঙ্গে মূল সমস্যাটি বাংলাদেশের ছিল, গঙ্গার পানি বন্টন। জিয়া সরকারের সময় ১৯৭৭ সালে স্বাক্ষরিত ৫ বছর মেয়াদী পানি বন্টন চুক্তিটি ১৯৮২ সালেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে এরশাদের শাসনামলে দেশে আবার পানি সংকট দেখা দেয় এবং ভারতের সঙ্গে রফা করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এরশাদ নিজে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির পক্ষে ছিলেন। যদিও কার্যক্ষেত্রে ভারতের আগ্রহ সামান্যই দেখা গেছে। বাংলাদেশ ৭ অক্টোবর দু'দেশের ভেতর একটি সমঝোতা স্মারকপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এর মেয়াদ ছিল ১৮ মাস। এতে '৭৭ সালের চুক্তিটির হিস্যায় সামান্য পরিবর্তন করে তাকেই বহাল রাখা হয়। কিন্তু সর্বনাশটি

www.pathagar.com

ঘটানো হয় গ্যারান্টি ক্লজ তুলে দিয়ে। '৭৭ সালের চুক্তিতে বলা ছিল, গঙ্গায় পানির অপ্রতুলতা থাকলেও বাংলাদেশের হিস্যার ৮০ ভাগ পূরণ করা হবে। এটা বাদ দেয়া হয়। উল্টে পানির অভাবে দু'পক্ষের ত্যাগের কথা বলা হয়। এ ছিল দুর্বল পররাষ্ট্রনীতির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। পরবর্তী সময়ে পদ্মায় পানির অপ্রতুলতার মাধ্যমে চুক্তির অসারতা প্রমাণিত হয়।

১৯৮৪ সালের ৩১ মে সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ শেষ হলেও ভারত আর কোন চুক্তিতে রাজী হয়নি। ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধী নিহত হবার পর তার পুত্র রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হন। তার সময়ে ১৯৮৫ সালের ১৮ থেকে ২২ নভেম্বর সময়কালের আলোচনার পর দ্বিতীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এতে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদীগুলোর পানি বন্টনের কথা বলায় আলোচনার ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত হয়। ১৯৮৮ সালে দ্বিতীয় সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ শেষ হলেও '৯০ সালের ডিসেম্বরে পতনের পূর্ব পর্যন্ত এরশাদ এ বিষয়ে আর কোন অগ্রগতি করতে পারেন নি। ভারত-বাংলাদেশ পানি বন্টন সমস্যার সমাধানে এরশাদ সরকার আঞ্চলিক উদ্যোগের চেষ্টা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, পানি সম্পদ ভাগাভাগির প্রশ্নটি ভারত-বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার বদলে বহুপাক্ষিক আলোচনার ব্যবস্থা করা। এতে সমস্যাটির আন্তর্জাতিক রূপদান সম্ভব হত। বাংলাদেশ চেষ্টা করছিল চীন এবং নেপালকে সম্পৃক্ত করতে। এ উদ্দেশ্যে এরশাদ ১৯৮৭-৮৮ সালের বন্যার পর ভারত, নেপাল এবং চীন সফর করেন। কিন্তু ভারত এমনি উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করে। তারা বিষয়টিকে দ্বিপাক্ষিক হিসেবে চিহ্নিত করে এবং বাংলাদেশ ভারতীয় চাপের মুখে পিছু হটে আসে।

বরাবরের মত ভারতের সঙ্গে সীমান্ত চিহ্নিতকরণ নিয়ে বাংলাদেশের সমস্যাটি বহাল ছিল। ১৯৭৪ সালের ইন্দিরা-মুজিব সীমান্ত চুক্তি অনুসারে দু'দেশের ভেতর যে সীমান্ত চিহ্নিত করা হয়েছিল তা পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। বাংলাদেশ যদিও চুক্তিরত প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করেছিল; কিন্তু ভারত তা করেনি। ফলে বাংলাদেশের ছিটমহল সমস্যা যেমন অব্যাহত ছিল, তেমনি দু'দেশের ভেতর সীমান্ত বিরোধ লেগেই ছিল। ভারতীয় বিএসএফ-এর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর বহু নজির তখনকার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ভারত বে-আইনীভাবে তার সীমান্তের জিরো লাইন বরাবর প্রায় ৩২০০ কিঃ মিঃ জুড়ে কাটাতারের বেড়া নির্মাণের প্রয়াস চালায়। কিন্তু বাংলাদেশের তীব্র প্রতিবাদ এবং আন্তর্জাতিক চাপের মুখে এ লক্ষ্য পুরো কার্যকর করতে না পারলেও দু'দেশের সম্পর্ক অরেক দফা খারাপ হয়ে যায়।

জিয়া সরকারের সময় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় বিদ্রোহ নিয়ে ভারতের সঙ্গে যে প্রকট বিরোধ চলছিল এরশাদের সময়ও তা বহাল ছিল। পার্বত্য

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম এলাকায় তখন ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা-হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সেনাবাহিনীর সঙ্গে উপজাতীয় শান্তিবাহিনীর সংঘর্ষের বিষয়টি ছিল নিয়মিত। বিপুল পরিমাণ উপজাতীয় শরনার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল অনেক আগেই। অভিযোগ ছিল, ভারত উপজাতীয়দের সাহায্য-সহযোগিতা দিচ্ছে। ভারতের সঙ্গে, উপজাতীয়দের সঙ্গে একাধিক আলোচনার পরও সমস্যার কোন সুরাহা করতে পারেনি এরশাদ সরকার।

ভারতের সঙ্গে এরশাদের সময় অর্থনৈতিক যোগাযোগ বেড়েছিল বেশ। তবে অবৈধ যোগাযোগ বা চোরাচালানের প্রচণ্ডতা এরশাদ সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হন।

মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে এরশাদ সরকারের সম্পর্ক জিয়া সরকারের প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হয়েছিল। বিশেষ কোন জটিলতা এ সময়ের সম্পর্কের ভেতর দেখা যায়নি। তবে তার সময় কালে মুসলিম বিশ্বের দু'-তিনটি সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশকে কৌশলী হতে হয়েছিল। এর ভেতর ছিল ইরাক-ইরান যুদ্ধ, ফিলিস্তিন সমস্যা, আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদারিত্ব প্রভৃতি।

ইরাক-ইরান যুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষপাতিত্ব ছিল ইরাকের দিকে। মাওলানা মান্নানের মাধ্যমে ইরাকের সঙ্গে এরশাদ সরকারের যোগাযোগ জোরদার হয়েছিল। '৭১ সালে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সাথে মান্নানের নাম জড়িয়ে আছে। মান্নান এরশাদের মন্ত্রী ছিলেন। ইরাক-বাংলাদেশ সম্পর্কের নেপথ্যে অর্থ আদান-প্রদানের কথা অবসর প্রাপ্ত এক পররাষ্ট্র সচিব বলেছেন। ফিলিস্তিন প্রশ্নে বাংলাদেশ বরাবরের মতই সোচ্চার ছিল আরবদের পক্ষে। এ নীতিটি বাংলাদেশ শেখ মুজিবের সময়কাল থেকেই অনুসরণ করে আসছিল।

আফগানিস্তান নীতিটি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মৌলিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে অবস্থান ছিল সোভিয়েত বিরোধী। আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদারিত্ব ঘটার পর স্বভাবতই বাংলাদেশ জোরালো প্রতিবাদ জানায়। শুধু প্রতিবাদ-ই জানায়নি; বিভিন্ন ফোরামে এর বিরুদ্ধে সোচ্চারও ছিল। বহু বাংলাদেশী গোপনে আফগান মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ৩৯ এবং ৪০তম অধিবেশনে আফগান প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তৃতার সময়। এতে সোভিয়েত বিরোধী অবস্থান আরো একবার প্রমাণিত হয়। যদিও মাঝেমধ্যে বাংলাদেশ বেসরকারিভাবে আফগান কমিউনিষ্ঠ প্রতিনিধিদের ঢাকা আসতে দিয়ে সম্পর্ক ভাল করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ কৌশল বিশেষ কাজে আসেনি।

সৌদি আরবের সঙ্গে এরশাদ সরকার সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ করার ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক। আরো বেশি সাহায্য লাভ,

www.pathagar.com

জনশক্তি রপ্তানি এবং সৌদি আরবের রাজপরিবারের নিরাপত্তার জন্য যে পাকিস্তানী সৈন্য নিয়োগ দেয়া হয়, তার সঙ্গে বাংলাদেশী সৈন্য প্রবেশ করানো। অন্যসব উদ্দেশ্য সফল হলেও পাকিস্তানীদের সঙ্গে বাংলাদেশী সেনা নিয়োগের বিষয়টি বেশি দূর এগোতে পারেনি।

পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয় জিয়া সরকারের সময় থেকে। এরশাদ এ ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হন। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপানের মত দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক কখনোই জটিলতার মধ্যে পড়েনি। বরং বাংলাদেশের পুঁজিবাদী বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হবার পর থেকে এদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল স্থিতিশীল। এরশাদ এসব দেশ বিভিন্ন সময়ে সফর করেছেন; উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলও আদান-প্রদান হয়েছে। এদের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য গঠিত এইড কনসোর্টিয়াম তার দায়িত্ব পালন করেছে সাবলীলভাবে। পুঁজিবাদী দেশগুলোর নেতৃত্বে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই পুঁজিবাদী দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্থিতিশীলতার নেপথ্য কারণ ছিল মার্কিনীদের সঙ্গে বাংলাদেশের সু-সম্পর্ক।

এরশাদ ক্ষমতা দখলের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মৃদু সমালোচনা করা হলেও দু'সরকারের সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে সময় লাগেনি। সেনা শাসন জারির অপরাধে মার্কিন সরকার এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে কোন বিধিনিষেধ অথবা নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। বরং বাংলাদেশে সেনা শাসন জারির পর উন্নয়ন প্রক্রিয়া বহাল থাকবে, এমন আশা ব্যক্ত করেছিল। এক-ই সঙ্গে বাংলাদেশের প্রদত্ত মার্কিন সাহায্য অব্যাহত ছিল। পরবর্তীতে এরশাদ বহু বিতর্কিত তথাকথিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া দেশে শুরু করলে মার্কিনীরা তাকে স্বাগত জানায়। ১৯৮১ সালে এরশাদ জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশনে নিরস্ত্রীকরণের ওপর বক্তৃতা দেন। ১৯৮৩ সালের অক্টোবরে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। তখন রিগান সরকারের সঙ্গে তার ভাল বোঝাপড়াই হয়। ঐ সফরের পর ১৯৮৪ সালের প্রথমার্ধে ভারত-সোভিয়েত অক্ষের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়, বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গোপন চুক্তি করেছে চট্টগ্রাম বন্দর এবং আরো কিছু বঙ্গোপসাগরের দ্বীপ মার্কিন নৌবাহিনীকে ব্যবহার করতে দেয়ার মর্মে। এমনও বলা হয় যে, চট্টগ্রামে মার্কিন নেভাল বেজ প্রতিষ্ঠা করতে দেয়া হবে। বাংলাদেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসব অভিযোগ পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করে জানায়, দু'দেশের ভেতর কোন প্রকার সামরিক চুক্তি নেই। তবে বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে অনুমান করেন, দু'দেশের ভেতর একটি সামরিক চুক্তির বিষয়ে '৮০ দশকে আলোচিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে সেটি বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। ১৯৮৮ সালের নভেম্বরে এরশাদ আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। রিগানের সঙ্গে তার আলোচনা ফলপ্রসূ ছিল।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের প্রতি মার্কিনীদের সাহায্যের হাত পুরো এরশাদের সময়কাল ধরে সম্প্রসারিত ছিল। তবে বাংলাদেশের প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমাণের সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সম্পর্ক নিবিড় ছিল। স্নায়ুযুদ্ধ চলার সময় বাংলাদেশ যে পরিমাণ মার্কিন সাহায্য লাভ করত, তা পরবর্তীতে কমে আসে। ১৯৮৪-৮৯ সালে তা কমে দাড়ায় মাত্র ৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বরাজনীতিতে সোভিয়েত প্রভাব কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যাপী মার্কিন সাহায্যের পরিমাণও কমে আসে।

বাংলাদেশ-মার্কিন তথা পুঁজিবাদী দেশগুলোর সম্পর্কের ভেতর যদিও তেমন টানাপড়েন দেখা যায়নি বা আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিভিন্ন ইস্যুতে এদের ভেতর প্রায় কোন মত দ্বৈততা দেখা যায়নি, তবুও এদের সম্পর্ককে নিরবিচ্ছিন্ন বলা যাবে না। অন্তত একটি বিষয়ে তারা সব সময় দ্বিমত পোষণ করেছে; সেটি হচ্ছে ফিলিস্তিন ইস্যু। পশ্চিমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল পুরো বিপরীত। যদিও ইরাক ইস্যুতে বাংলাদেশ ৫ হাজার সৈন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শ মত জাতিসংঘ বাহিনীতে পাঠিয়েছিল।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক এরশাদের সময় ছিল জিয়া সরকারের অনুরূপ। চীনের প্রতি ছিল পক্ষপাতিত্ব; সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বৈরিতা। বাংলাদেশ জাতীয় স্বার্থ এবং নিরাপত্তার জন্য চীনের পক্ষ নিয়েছিল। অন্যদিকে চীনও আঞ্চলিক রাজনীতিতে ভারত-সোভিয়েত বিরোধী মিত্র পেয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর ভেতর চীনকে বেছে নেয়া মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিমা মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার অনুকূল ছিল। পুরো '৮০ দশক জুড়ে ঢাকার সেনা শাসক সব সময়-ই চীনকে বাংলাদেশের কৌশলগত এবং রাজনৈতিক সহযাত্রী হিসেবে বিবেচনা করেছে। এরশাদ একাধিকবার চীন সফর করেন। এর ভেতর ১৯৮৫ এবং '৮৭ সালের চীন সফর বিশেষ উল্লেখ করার মত। '৮৫ সালে চীনা রাষ্ট্রপতি লি জিয়াননিয়ান বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন। চীন-ভারত উত্তেজনার মুখে চীন বাংলাদেশের নিকট থেকে এ মর্মে নিশ্চয়তা চাইছিল যে, বাংলাদেশ সম্ভাব্য কোন চীন-ভারত যুদ্ধে ভারতকে বাংলাদেশের ভূ-খণ্ড ব্যবহার করতে দেবে না। ১৯৮৭ সালে এরশাদ চীন সফরের সময় সে নিশ্চয়তা প্রদান করেন। ১৯৮৯ সালে চীনা প্রধানমন্ত্রী লি পেং বাংলাদেশ সফরে এলে চারটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। '৯০ সালের জুন মাসে পতনের মাত্র ক'মাস আগেও এরশাদ চীন সফর করেন।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে বাংলাদেশ এবং চীন পুরোপুরি একমত পোষণ করে। এমন কি ফিলিস্তিন সমস্যা প্রসঙ্গে বাংলাদেশ এবং চীনের অবস্থানের ভেতর কোন পার্থক্য নেই। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে এ দু'দেশ পরস্পরের জোরালো সমর্থক ছিল। বাংলাদেশ 'চায়না-তাইওয়ান ফরমুলা' পর্যন্ত সমর্থন করেছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে পরস্পরকে সমর্থন দান এবং আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলো একমত পোষণ করায় দেশ দু'টির ভেতর এক ধরনের পরস্পর নির্ভরশীলতা গড়ে ওঠে।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক দিক থেকে চীন বাংলাদেশের একটি সাহায্য দানকারী দেশ। বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নামের একটি বড় ব্রিজ বুড়িগঙ্গা নদীর উপর চীন নির্মাণ করে দেয় এরশাদের সময়। এছাড়া কারিগরি সহায়তা, সুদ মুক্ত ঋণ প্রভৃতি চীনের কাছ থেকে বাংলাদেশ পেলেও অন্য দাতা দেশের তুলনায় সাহায্যের পরিমাণ ছিল অন্তত ৮৯ পর্যন্ত অনেক কম।

তবে সামরিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ চীনের ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। চীন বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা বড় সামরিক দ্রব্যাদি সরবরাহকারী দেশ হিসেবে '৮০ দশকে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশ সামরিক ক্রেতা হিসেবে চীনের কাছে এতটাই গুরুত্ব বহন করে যে, এখানে চীনের সামরিক সচিব আছেন। অবশ্য '৮০ দশকের শেষদিকে এসে ভারত-চীন সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে শুরু করলে এবং পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের উপক্রম হলে বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের গুনগত পরিবর্তন শুরু হয়। সেই পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় মাত্রায় পরিস্ফুটিত হয় আরো পরে।

চীনের সঙ্গে সুসম্পর্কের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে '৮০ দশকে সোভিয়েত-ভারত অক্ষের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপড়েনকে ধরা হত। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম ছিল না। জিয়া সরকারের সময় থেকেই এমনটি ঘটছিল। আগেই বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির কৌশলত কারণে এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনে বাংলাদেশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বদলে চীনকে প্রাধান্য দিতে হয়েছিল। এরশাদ আমলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে ১৯৮৩ সালের ২৯ নভেম্বর। তখন ঢাকায় সোভিয়েত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ১৪ জন সোভিয়েত কূটনৈতিককে বাংলাদেশে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। এরশাদের পুরো শাসনকাল জুড়ে আর সে অর্থে সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। উচ্চ পর্যায়ের রাষ্ট্রীয় সফর প্রায় হয়নি। '৭০ দশকের মাঝামাঝি থেকে সোভিয়েত সাহায্য স্বাভাবিক কারণেই কমে গিয়েছিল। এরশাদের সময় বিষয়টি তেমনই ছিল। অথচ ১৯৮২ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্রুত এরশাদের সামরিক সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রশান্ত করেছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত খারাপ-ই রয়ে যায়।

এরশাদের শাসনকালে অন্তত তিনটি উল্লেযোগ্য ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে। প্রথমতঃ ঢাকায় ইসলামী সম্মেলন সংস্থার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক, দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের নেতৃত্বে সার্ক গঠিত হওয়া এবং তৃতীয়তঃ বাংলাদেশের প্রতিনিধির জাতিসংঘের সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়া।

১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ১৪তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরশাদ সরকার এবং বাংলাদেশের এটা ছিল বড় ধরনের সাফল্য। সম্মেলনে বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্বের

www.pathagar.com

আরো নিকটবর্তী হবার চেষ্টা করে। তাদের সে প্রয়াস সফল ছিল। সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি যেমন উজ্জ্বল হয়, তেমনি নিজের অবস্থান মুসলিম বিশ্বের নিকট তার পক্ষে স্পষ্ট করা সহজ হয়।

১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ার ৭ জাতি বৈঠকের মাধ্যমে সার্ক আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। এ যাত্রা শুরুর আগে এর উদ্ভাবক এবং পরিকল্পক ছিলেন জিয়াউর রহমান। তার আমলেই প্রাথমিক সকল প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রাথমিক সকল প্রস্তুতির পর ১৯৮৩ সালের ১-২ আগস্ট দিল্লিতে বসে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন। উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। আরো আলোচনা এবং একটি গঠনতন্ত্র পাকাপাকি করার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৮৫ সালে ঢাকায় সার্ক তার যাত্রা শুরু করে। সার্ক আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা হিসেবে বহুমুখী কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। সার্কের যাত্রা শুরু বাংলাদেশের জন্য বিশেষ কূটনৈতিক সফলতা। এরশাদ জিয়া সরকারের সময় পরিকল্পিত সার্ক গঠনে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে এর সপক্ষে ভূমিকার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন।

এরশাদের সময় অন্য একটি বড় অর্জন ছিল, তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর বাংলাদেশের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জাতিসংঘের সভাপতি নির্বাচিত হওয়া। সফলতাটি বড় কূটনৈতিক সাফল্য হলেও প্রকৃতপক্ষে এর নেপথ্যে ছিল অন্য ঘটনা। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের প্রার্থী, রাষ্ট্রদূত কে. এম. কায়সার ইরাকের প্রার্থীর সঙ্গে সমান ভোট পেয়ে লটারিতে হারেন। তখন এশীয় দেশগুলো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, পরে যখন সভাপতি পদে আবার এশীয় প্রতিনিধিত্বের সময় আসবে, তখন বাংলাদেশকে সুযোগ দেয়া হবে। সুতরাং ১৯৮৬-৮৭ সালে এশীয় কোটা থেকে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত হুমায়ুনের সভাপতি পদে বিজয়ী হতে বেগ পেতে হয়নি।

www.pathagar.com

বেগম খালেদা জিয়ার পররাষ্ট্রনীতি

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ক্ষমতাসীন হয়। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দেশে চালু হয় সংসদীয় গণতন্ত্র। এক দীর্ঘ সময় পর বাংলাদেশে সত্যিকারের গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। খালেদা জিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করে তার সরকারের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তিনটি মূলনীতির কথা বলেন। **প্রথমতঃ** স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা, **দ্বিতীয়তঃ** আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও মুসলিম উম্মার সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং **তৃতীয়তঃ** দেশের প্রয়োজনে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করা। সুতরাং বিএনপি সরকারের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অনুধাবনে কষ্ট হয় না।

বাংলাদেশ জিয়াউর রহমানের শাসনামল থেকে সত্যিকার অর্থে পশ্চিমা ঘেষা পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করছে তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং বৈশ্বিক রাজনীতির সুবিধার কথা চিন্তা করে। দ্ররিদ্র হিসেবে অর্থনৈতিক প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয়া খুব-ই জরুরী ছিল। এ হিসেবকে মাথায় রেখে তার বৈশ্বিক রাজনীতি এবং বিভিন্ন দেশ ও জোটের সঙ্গে সম্পর্ক গড়া। ঐ বৃত্ত থেকে তিনি আর বের হতে পারেন নি। খালেদা জিয়াও নয়। সুতরাং খালেদা সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যখন বলেন আমরা স্বাধীন ও সময়োপযোগী পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ কর। তখন এর অর্থ বোঝা দুরুহ হয় না। তবে 'স্বাধীন' শব্দটা নিয়ে খটকা জাগে বৈকি। একটি নির্ভরশীল অর্থনীতির দেশ কতটা স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করতে সক্ষম, তা তর্কাতীত নয়। বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে মুস্তাফিজুর রহমান, বি এন পির পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছিলেন, বাংলাদেশ জিয়া অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতিই অনুসরণ করবে। খালেদা সরকারের পরবর্তী কার্যক্রম পর্যালোচনা করে এ কথার সত্যতা পাওয়া গিয়েছিল।

খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিতে বিশেষ উত্থান-পতন লক্ষ্য করা যায়নি। বলা যায়, অনেকটা গতানুগতিক ধারায় পররাষ্ট্র নীতি পরিচালিত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য এবং পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থেকেছে। ভারত এবং রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল অনেকটা শীতল। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে বিএনপির পররাষ্ট্র নীতি ছিল সফল।

বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ছিল বেশ জটিল। অনেকটা শীতল। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য, এ সরকার জিয়া সরকারের মত সরাসরি ভারত বৈরিতার পথ ধরেনি। বরং তারা বেশ খানিকটা ব্যতিক্রমী ছিল। ভারতের সঙ্গে এক ধরনের সহাবস্থানের নীতি খালেদা সরকার বহাল রেখেছিলেন। কিন্তু দ্বিপাক্ষিক সমস্যাগুলোর কোন সমাধান ঐ সময় খালেদা সরকার করতে পারেনি। ভারতের সঙ্গে কতগুলি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা বাংলাদেশে

www.pathagar.com

বিরাজ করছিল। ফারাক্কা সমস্যা, সীমান্ত সমস্যা, উপজাতীয় সমস্যা প্রভৃতি। অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ এবং ভারত খালেদা জিয়ার সময় অন্যান্য সময়ের তুলনায় অনেকটা নিকটবর্তী হতে পারলেও দু'দেশের বিপুল বাণিজ্য ঘাটতির বিশেষ হেরফের হয়নি। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ভাবে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে অবশ্য এজন্য শুধু ভারত দায়ী নয় বরং আরো আনুষঙ্গিক কারণ বিদ্যমান।

খালেদা সরকারের সময় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুটি ছিল গঙ্গার পানি বণ্টনের প্রশ্ন। পূর্বের এক অধ্যায়ে ইতোমধ্যেই বলা হয়েছে, গঙ্গার পানি বণ্টনের প্রশ্নটি বাংলাদেশের বিপুল অর্থনৈতিক লাভক্ষতির সঙ্গে সম্পর্কিত। পর্যাপ্ত পানির অভাবে বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ ক্ষতির কথা জিয়া সরকারের আমলেই বিশেষজ্ঞ টিম কর্তৃক তৈরি শ্বেতপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছিল। ভারতের সঙ্গে কোন প্রকার পানি চুক্তির অবর্তমানে ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহারের মাত্রা এতটাই প্রকট হয়েছিল যে, ১৯৯২ সালে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিচে মাত্র ১৩০০০ কিউসেক পানি প্রবাহিত হয়েছে এবং ১৯৯৩ সালের ৩০ মার্চ এটি ঁদাড়ায় সর্বকালের সব নিম্ন পরিমাণ ৯২১৮ কিউসেক। সুতরাং বলাই বাহুল্য, বাংলাদেশে পানির এই প্রকট অভাব দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। খুব সম্ভবত খালেদা সরকারের সঙ্গে শীতল সম্পর্কের কারণের ভারত এমনি পানি প্রত্যাহারে উৎসাহ পেয়ে থাকবে।

সুতরাং ফারাক্কা সমস্যা বা পানি বণ্টন সমস্যা সমাধানে খালেদা জিয়ার সরকারকে দ্রুত উদ্যোগ নিতেই হয়েছিল। কিন্তু ভারত সরকারের নিকট থেকে সে অর্থে সাড়া মেলেনি। একাধিকবার দু'দেশের পানি বিশেষজ্ঞ এবং কর্মকর্তারা বসে সমস্যার জট খুলতে পারেনি। এমনকি মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনার মাধ্যমেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। ভারত সমস্যার সমাধানে আন্তরিক প্রয়াস চালানোর একাধিক অঙ্গীকার সত্ত্বেও সমস্যার সমাধানে কোন অগ্রগতি হয়নি ভারতের জন্যই।

বাংলাদেশকে শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘে সমস্যাটি উপস্থাপন করতে হয়েছে। বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯৩ সালের ১ অক্টোবর জাতিসংঘের ৪৮তম অধিবেশনে তার বক্তৃতার সময় ফারাক্কা সমস্যার প্রতি বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু বাংলাদেশের ঐ আবেদন বিশ্ব সম্প্রদায়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়নি। কূটনৈতিকভাবে বাংলাদেশের প্রচেষ্টা ছিল অনেকটা নিষ্ফল। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন সঠিক এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ছাড়াই অনেকটা আকস্মিকভাবে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সম্মেলনে ফারাক্কা প্রসঙ্গ তুলেছিল। ফারাক্কা প্রসঙ্গ উত্থাপনের আগে প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন জোগাড় করা উচিত ছিল, যেমনটি জিয়া সরকারের সময় করা হয়েছিল। জাতিসংঘে বিষয়টি উত্থাপন ভারত ভালভাবে নেয়নি। তারা এটাকে দ্বিপক্ষীয়

www.pathagar.com

বিষয় আন্তর্জাতিকীকরণের চেষ্টা হিসেবে দেখেছেন। ফারাক্কা প্রশ্নে চীনের মত বন্ধু দেশও বিষয়টি দ্বিপক্ষীয় অভিমত দিয়ে হতাশ করেছে। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চীনা উপপ্রধানমন্ত্রী সিয়া সিচেন বাংলাদেশ সফরকালে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। খালেদা জিয়ার শাসনামলে শেষ পর্যন্ত ফারাক্কার পানি বণ্টন নিয়ে ভারতের সঙ্গে কোন প্রকার সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। উল্টো ভারত সমাধানের জন্য কিছু শর্ত জুড়ে দিয়েছিল।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্য একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল উপজাতীয় সমস্যা। শেখ মুজিবুর রহমানের সময় থেকেই উপজাতীয়রা তাদের আত্ম-পরিচয়ের প্রশ্নে সরকারি উদ্যোগের বিরোধিতা করছিল এবং সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক খুব-ই তিক্ত হয়ে উঠেছিল। জিয়া সরকারের সময় যখন বিপুল সংখ্যক বাঙ্গালীর অনুপ্রবেশ ঘটানো হয় পাহাড়ি এলাকায়, তখন চাকমাদের নেতৃত্বে উপজাতীরা বিদ্রোহ করে ভারতে আশ্রয় নিতে শুরু করে। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল না থাকায় ভারত উপজাতীয়দের আশ্রয় দিয়ে তাদের প্রার্থিত সশস্ত্র ট্রেনিং প্রদান করে। সেই শুরু। উপজাতীয়দের এ লড়াই চলেছে দীর্ঘ সময় ধরে।

খালেদা সরকারের সময়ও সশস্ত্র বিদ্রোহ চলছিল। বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনা অভিযান জিয়ার আমল থেকেই ধারাবাহিকভাবে চলছিল। খালেদা সরকার পূর্বসূরীদের মত সশস্ত্র অভিযানের পাশাপাশি আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানেরও চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। এ প্রক্রিয়া সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার তার রাজনৈতিক উদ্যোগ হিসেবে উপজাতীয় বিদ্রোহীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। সাধারণ ক্ষমা অনুসারে অস্ত্র সহ আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সদস্যকে বিভিন্ন অংকের টাকা দেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়; আত্মসমর্পণকারীদের পুনর্বাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণ ক্ষমা অনুসারে বেশ কিছু বিদ্রোহী ফিরে আসে। এখানে বলা দরকার, পূর্বের সরকারগুলো এর আগে আরো চার বার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও বিশেষ লাভ হয়নি।

সর্বাপেক্ষা বড় চমকটি আসে ১৯৯২ সালের ১২ মে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার খাগড়াছড়ি সফরের সময়। তিনি সেখানে বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় একটি গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানের ঘোষণা দেন। পাহাড়িরাও ঘোষণাটিকে ইতিবাচকভাবে নেন। ঐ বছরের জুলাই মাসের ১২ তারিখে ৯ জন সংসদকে নিয়ে একটি কমিটি হয় এবং এর প্রধান হন যোগাযোগমন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) অলি আহমেদ। এর এক উপ- কমিটির প্রধান ছিলেন সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন। কর্নেল অলির নেতৃত্বে ৭ বার এবং রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে ৬ বার শান্তিবাহিনীর সঙ্গে আলোচনা করে সংসদীয় কমিটি। আলোচনায় অনেকটা

www.pathagar.com

অগ্রগতি হলেও ফলপ্রসূ হয়নি। এর পেছনে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনও একটা কারণ। ১৯৯২ সালের পর থেকে চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকায় প্রচুর উন্নয়ন ও অবকাঠামো নির্মাণমূলক পদক্ষেপ নেয় বিএনপি। বিভিন্ন ধরনের সংস্কার কার্যক্রমও চালানো হয়। পরিস্থিতির উন্নতি এবং পার্বত্য বিদ্রোহী ও বাংলাদেশ সরকারের নিকটবর্তী হবার প্রেক্ষাপটে শান্তিবাহিনী ১৯৯২ সালের ১০ আগস্ট একতরফা অস্ত্র বিরতি ঘোষণা করে। অবশ্য ত্রিপক্ষীয় আলোচনায় (বাংলাদেশ-ভারত এবং শান্তিবাহিনী) উদ্বাস্তুদের দেশে ফিরে আসার বিষয়ে ভাল অগ্রগতি হয়েছিল। কুড়ি হাজারের বেশি উদ্বাস্তু সে সময়ে দেশে ফিরে প্রত্যাবাসিত হয়। এ পর্যন্তই। বিএনপি সরকারের সময়ে পার্বত্য উপজাতি সমস্যার আর বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। ১৯৯৫ সালের পর সব একরকম বন্ধ হয়ে যায়। ঐ সময় থেকে বিএনপির বিরুদ্ধে দেশে দারুণ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়; তারা সেটি নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে ভাবার সময় তাদের ছিল না।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক আরো কতকগুলো কারণে টানাপড়েনের ভেতর ছিল। পুরো সময় বিএনপি আমল ধরে পুশব্যাক নিয়ে দু'দেশের ভেতর উত্তেজনা বিরাজ করেছে। পুশব্যাক হচ্ছে ভারত কর্তৃক তথাকথিত বাংলাদেশী, যারা ভারতের অভিবাসী, তাদের জোর করে বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দেয়া। বাংলাদেশ সব সময়ই এসব ব্যক্তিদের বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কহীন বলে পরিস্কারভাবে জানিয়েছে। তাছাড়া এমনি অপতৎপতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কাটা তারের বেড়া নির্মান নিয়েও কম সমস্যা হয়নি। ভারত নোম্যান্স ল্যান্ডের ১৫০ গজের ভেতর কাটাতারের বেড়া নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিলে বাংলাদেশ আপত্তি তোলে। কারণ সীমান্তের নোম্যান্স ল্যান্ডের ১৫০ গজের ভেতর কোন প্রকার কাটাতারের বেড়া নির্মাণ আন্তর্জাতিক আইন অনুসারের অবৈধ। সীমান্ত সমস্যা ভারতের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরেই চলে আসছিল। এর নেপথ্যে ছিল সীমানা রেখার সবটুকু চিহ্নিত না হওয়া। বিএনপি আমলে দু'দেশ সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা ও কাজ শুরু করলে বাংলাদেশ ফারাক্কা প্রসঙ্গ জাতিসংঘে উত্থাপনের পর তা বন্দ হয়ে যায়। তবে একটি বড় অগ্রগতি দু'দেশের ভেতর হয়েছিল বিএনপি আমলে। অগ্রগতিটি ছিল তিন বিঘা করিডোর উন্মুক্ত করে দেয়া। দীর্ঘ বাদানুবাদের পর বাংলাদেশের ছিটমহলে যাবার পথটি খুলে দেয়া হয়। যদিও ১৯৭৪ চুক্তি অনুসারে পথটি বাংলাদেশের স্থায়ীভাবে পাওয়ার কথা। কিন্তু সেটি কার্যত কার্যকর হয়নি। তিন বিঘা করিডোরটি দিনেরবেলা এক ঘন্টা অন্তর এক ঘন্টা খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত দু'দেশ মিলে নিয়েছিল।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দু'-একটি চুক্তি হলেও বাণিজ্যের ভারসাম্য লক্ষ্যণীয় মাত্রায় ভারতের দিকে ঝুঁকে ছিল। বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৩২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মত। অর্থনৈতিক টাস্কফোর্স গঠন সহ বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হলেও পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়নি।

মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বরাবর-ই ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির একটি প্রধান উদ্দেশ্য, মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা। এ উদ্দেশ্যের নেপথ্যে মুখ্যত অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান। মুসলিম দেশগুলার গুরুত্ব বোঝা যায় খালেদা জিয়ার ক্ষমতা গ্রহনের পর প্রথম বিদেশ সফরের জন্য সৌদি আরবকে বেছে নেয়ার ভেতর। ১৯৯১ সালের ২৫ মে তিনি সৌদি আরব যান। এ সফরের সময় তিনি কুয়েতও যান।

মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিএনপি আমলে বিশেষ কোন উত্থানপতনের শিকার হয়নি। বাংলাদেশ তার চিরাচরিত নীতি অনুসারে বিভিন্ন ইস্যুতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে সমর্থন জানিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের সৈন্যদের অবস্থান বহাল ছিল, বিএনপি আমল জুড়ে। হজ্জযাত্রী নিয়ে সৌদি সরকারের সঙ্গে সামান্য মতবিরোধ ছাড়া বিশেষ কোন সমস্যা ৫ বছরে দেখা যায়নি। ফিলিস্তিন সমস্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার অকুণ্ঠ সমর্থন ফিলিস্তিনীদের প্রতি বহাল রেখেছিল।

১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফিলিস্তিন-ইসরাঈল চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে বাংলাদেশ তাকে আনন্দের সঙ্গে স্বাগত জানায়।

মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ এ সময় ভালভাবে সংরক্ষিত রাখা সম্ভব হয়। বিএনপি সরকারের শাসনামলের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত প্রায় দশ লক্ষ বাংলাদেশী বিভিন্ন মুসলিম বিশ্বে কর্মরত ছিল। তাদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ছিল প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা। বিএনপি সরকার শেষ পর্যন্ত আরো শ্রম রপ্তানির জন্য মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তাতে ফলও পাওয়া গেছে।

পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশ জিয়ার আমল থেকেই সু-সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। খালেদার আমলেও তা বহাল ছিল। স্নায়ু যুদ্ধের অবসানের কারণে সাহায্য- সহযোগিতার মাত্রা পশ্চিমারা কিছু কমিয়েছিল বটে, তবে বাংলাদেশ আপন প্রয়োজনেই পশ্চিমা ঘেঁষা নীতি বহাল রেখেছিল। এককেন্দ্রিক বিশ্বে বাংলাদেশের গুরুত্ব কিছু কমেছিল, বলাই বাহুল্য। পশ্চিমা পুঁজিবাদীদের বিভিন্ন সাহায্য এবং বাংলাদেশের জন্য গঠিত এইড কনসোর্টিয়ামের সাহায্য মিলিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ খালেদা সরকার পেয়েছিলেন নিয়মিত। পুঁজিবাদী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক গতিতে চললেও এদের নেতৃত্বে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তার

www.pathagar.com

সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রক্ষা করতে হয়েছে বাংলাদেশকে। যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া এশীয় পুঁজিবাদী দেশ জাপানকে বাংলাদেশ আলাদাভাবে সবসময় বিচার করে। খালেদা সরকারও তা করেছিলেন।

এরশাদের শাসনামলের শেষদিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বশান্তি রক্ষা কার্যক্রমে জাতিসংঘ বাহিনীতে সৈন্য প্রদানের মাধ্যমে অংশ নিতে শুরু করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের এ ভূমিকাকে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে দেখছিল। কারণ জাতিসংঘের বহুজাতিক বাহিনীগুলো প্রকৃতপক্ষে মার্কিন প্রভাবিত এবং প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশ বিশ্ব শান্তি রক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশংসাই শুধু কুড়ায়নি, বরং তার বলিষ্ঠ পররাষ্ট্র নীতির নমুনা তৈরি করেছে। বিশ্ব রাজনীতিতে তার এ সক্রিয় উপস্থিতি উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গঠনে সহায়ক হয়েছে। বেগম খালেদা জিয়া বিশ্বশান্তি রক্ষার ভূমিকা অব্যাহত রেখেছিলেন শেষ পর্যন্ত। যেসব স্থানে আগেই সৈন্য পাঠানো হয়েছিল, সেগুলো বহাল তো ছিলই, একই সঙ্গে আরো নতুন উদ্যোগের সঙ্গে বাংলাদেশ যুক্ত হয়েছিল।

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে যুক্তরাষ্ট্র তার প্রশংসা করে। অথচ এরশাদের ৯ বছরের স্বৈরশাসনও যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন লাভে সক্ষম হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের নীতির পরিবর্তনের নেপথ্যে ছিল স্নায়ু যুদ্ধের অবসান। এককেন্দ্রিক বিশ্বে আর একটি পরাশক্তির উত্থান না ঘটার নিশ্চয়তা সে পেতে চাইছিল বিশ্বময় আদর্শ হিসেবে অন্য কিছুর বদলে গণতন্ত্রকে বিস্তারের মাধ্যমে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসন বা খালেদা জিয়া সরকারের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হওয়া মার্কিন সরকারকে স্বস্তি দিয়েছিল।

খালেদা সরকারের সময় মার্কিন সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক সামান্য জটিলতার ভেতর পড়েছিল। মার্কিনীরা রোহিঙ্গা শরনার্থীদের জোর করে ফেরত পাঠানো, গার্মেন্টস শিল্পে শিশু শ্রম বন্ধের বিষয় এবং মানবাধিকার নিয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। মার্কিন সরকারের এ বিপরীত অবস্থান বাংলাদেশের জন্য বিশেষ অস্বস্তির কারণ হয়। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ মার্কিন দাবির প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটায়।

বাংলাদেশের দিক থেকে মার্কিনীদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজনটি ছিল অর্থনৈতিক। বাংলাদেশ-মার্কিন বাণিজ্যে বাংলাদেশের পক্ষে ভারসাম্য ছিল প্রায় চারশ' মিলিয়ন ডলার। এর বাইরে বিপুল পরিমাণ মার্কিন সাহায্য তো আছেই। মার্কিনীদের সঙ্গে উদ্বৃত্ত বাণিজ্য বাংলাদেশের জন্য বিশেষ লাভজনক। এ অবস্থায় নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড (নাফটা) বাংলাদেশকে বিশেষ চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। বেশ আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল পোশাক শিল্প নিয়ে।

জাপানের সঙ্গে সম্পর্কটিও মোটামুটি অর্থনৈতিক। '৮০ থেকে জাপান-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক যৌথ কমিটি কাজ করছে। খালেদা জিয়ার সময়ও

www.pathagar.com

এটি অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশ-জাপান বাণিজ্যও বেশ বড় আকৃতির। বাংলাদেশ জাপানের নিকট থেকে বিপুল সাহায্য পেয়ে থাকে। অর্থনৈতিক সম্পর্কের বাইরে জাপানকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে সেই অর্থে দেখা যায়নি কখনোই।

'৯০ দশকের মাঝামাঝি থেকে মার্কিনীরা অনেকটা আযাচিত অথচ সক্রিয়ভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বেশি মাত্রায় আগ্রহ দেখাতে শুরু করে। বিভিন্ন ইস্যুতে এটি দেখা গেছে। এর বড় প্রমাণটি হচ্ছে, বিএনপির বিরুদ্ধে বিরোধীদের আন্দোলনের সময় মার্কিনীরা সমস্যা সমাধানে মন্তব্য তো করেছেই, চাপও প্রয়োগ করেছে। এখন পর্যন্ত এধারা অব্যাহত আছে। খালেদার সময় মার্কিন ফার্স্ট লেডি হিলারী ক্লিন্টনের সফর দু'দেশের বন্ধুত্বের নিদর্শন ছিল।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের ভেতর বাংলাদেশের পছন্দ চীন। এর কারণ পূর্বে ব্যাখ্যাত হয়েছে। খালেদা সরকারের সময় সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের অস্তিত্ব ছিল না। তবুও সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরসূরী রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের তেমন ভাল সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। চীনের সঙ্গে চিরাচরিত সম্পর্কটাই বহাল ছিল। তবে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে খালেদা জিয়া এরশাদের তুলনায় কিছুটা সামনে বাড়তে পেরেছিলেন। এরশাদের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু খালেদা জিয়ার আমলে অন্তত মন্ত্রী পর্যায়ে সফর হয়েছে সোভিয়েত উত্তরসূরী রাশিয়ার সঙ্গে। ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুস্তাফিজুর রহমান এবং ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী এম. এ. মান্নান রাশিয়া সফর করেন। উভয় সফর-ই নিয়ম মাফিক বা প্রটোকলধর্মী ছিল; উষ্ণতা ছিল সামান্যই। বলা যায় বাংলাদেশ এবং রাশিয়া বা তার মিত্রদের সম্পর্কের বিষয়টি এক রকম নির্ধারিতই হ,য়ে গিয়েছিল। সমাজতন্ত্রের অবসানের পর ঐ সূত্র থেকে সহযোগিতা পাবার সম্ভবনা কমে যাওয়ায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিতে দেশগুলোর গুরুত্ব আরো কমে যায়।

চীনের সঙ্গে ব্যাপারটি উল্টো। দিন দিন ঘনিষ্ঠতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের গুণগত উন্নতি অব্যাহত রয়েছে দেশটির সঙ্গে। চীনের দিক থেকেও বাংলাদেশের গুরুত্ব বেড়েছিল স্নায়ু যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। চীন তার অঞ্চলে মার্কিনী প্রভাবের বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। ফলে ভারতের সঙ্গে লম্বা বিরোধের পর চীন-ভারত সম্পর্কের বরফ গলাতে তৎপর হয় উভয়েই। বাংলাদেশের গুরুত্বও বাড়ে সে কারণেই। অবশ্য মার্কিনীদের নিকটও বাংলাদেশের গুরুত্ব ছিল। খালেদা জিয়া ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম বছরেই ১৯৯১ সালের জুনে চীন সফর করেন। সফর সফল ছিল। ১৯৯৩ সালে পিপল্‌স্ কংগ্রেসে প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছিলেন। ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বরে চীনের নারী সম্মেলনে খালেদা

www.pathagar.com

জিয়া যোগ দিয়েছিলেন। চীন থেকেও একই বছর আগস্টে তার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করেন। ১৯৯৩ সালে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চীন বৃহত্তর বন্ধুত্বের ইঙ্গিত দেয়। আব্দুস সামাদ আজাদও বিএনপি আমলে বিরোধী দলের নেতা হিসেবে চীন সফর করেন। এ সবই বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সব দলের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার এ চীনা নীতি বাংলাদেশ-চীন ভবিষ্যৎ সম্পর্কের জন্য বিশেষভাবে অনুকূল। অর্থনৈতিক সম্পর্কের তেমন হেরফের খালেদা জিয়ার আমলেও হয়নি। মূল লেনদেন ছিল সামরিক বিষয় নির্ভর।

নিকট প্রতিবেশীদের ভেতর বিএনপি আমলে মায়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক হঠাৎ করেই অবনতি ঘটেছিল রোহিঙ্গা সমস্যাকে কেন্দ্র করে। এমন কি যুদ্ধাবস্থারও উদ্ভব হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তেমনটি আর ঘটেনি। দু'দেশের ভেতর আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হয়। জিয়াউর রহমানের সময়ের ঘটনাটিও অনেকটা এমন ছিল। অন্য প্রতিবেশীদের ভেতর পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের তেমন উত্থান-পতন হয়নি। পূর্বের মত বিএনপি আমলেও বাংলাদেশের প্রাপ্ত সম্পদ বা আটকে পড়া পাকিস্তানীদের ফেরতের বিষয়ে বিশেষ কোন অগ্রগতি হয়নি। বাকীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল স্বাভাবিক। খালেদা জিয়ার আমলে বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ফোরামে দক্ষ কূটনীতির স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৯১ সালের অক্টোবরে হারারে এবং ১৯৯৩-এর অক্টোবরে সাইপ্রাসে ১১ ও ১২তম কমনওয়েলথ সম্মেলনে বাংলাদেশ ভাল ভূমিকা রাখে। খালেদা তার শাসনামলে নিজে তিনবার জাতিসংঘ সম্মেলনের অধিবেশনে যোগ দেন । সাধারণ পরিষদের অধিবেশনগুলো হচ্ছে– ১৯৯২ সালের ৪৭তম, ১৯৯৩ সালের ৪৮তম এবং ১৯৯৫ সালের ৫০তম। বাংলাদেশের দিক থেকে এটি ইতিবাচক কূটনীতি ছিল। ১৯৯৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের দু' দিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে পরের বছরের জন্য সংস্থা দু'টির পরিচালনা পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান। অর্থনৈতিক কূটনীতির দিক থেকে বিচার করলে এটি বড় ধরনের সাফল্য ছিল। ১৯৯৩ সালে সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন ১০ এবং ১১ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। দু'বছর এটি পিছিয়ে সম্মেলনই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। খালেদা জিয়া সার্কের সভাপতির দায়িত্ব নেন। এসব ছাড়া রুটিন মাফিক আরো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশ অংশ নিয়েছে বা দায়িত্ব পালন করেছে।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনার পররাষ্ট্রনীতি

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুৎ হবার পর দীর্ঘ একুশ বৎসর আওয়ামী লীগ ক্ষমতার বাইরে ছিল। ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। আওয়ামী লীগ নীতিগতভাবে তার পূর্বসূরী অন্য সরকারগুলোর তুলনায় ভিন্ন আদর্শের দল। তার বিদেশ-নীতিতেও এর প্রতিফলন থাকবে, এমনটি আশা করা গিয়েছিল; যেমনটি ছিল মুজিব ও তার পরবর্তী সরকারগুলোর ভেতর। কিন্তু অতটা ঘটেনি। সময় এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনের কারণে আওয়ামী লীগ সরকার তার বিদেশনীতি মুজিব সরকারের অনুরূপ করতে পারে নি। বরং মুজিব পরবর্তী সরকারগুলোর বিদেশ-নীতির সঙ্গেই তার মিল বেশি।

হাসিনা সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভাবিত এককেন্দ্রিক বিশ্ব নিশ্চত ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরসূরী রাশিয়া শুধু পুঁজিবাদী রাস্তাই ধরেনি, এক-ই সঙ্গে অনেকটা পশ্চিমা নির্ভরও হয়ে পড়েছে।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব তো রীতিমত অতীত। চীন সত্যিকারের পরাশক্তি হবার প্রয়াস চালাচ্ছে এবং ভারত-চীন সম্পর্কও অনেকটা স্বাভাবিক। এমনি একটা অবস্থায় হাসিনা সরকারের বিদেশনীতি নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ ছিল না। সুতরাং ইচ্ছা করলেও তার সরকার ১৯৭০ দশকে মুজিব সরকারের পররাষ্ট্র নীতিতে ফিরে যেতে পারেনি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং এককেন্দ্রিক বিশ্ব পরিস্থিতিতে মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার কোন বিকল্প নেই। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গেও সুসম্পর্ক রাখা জরুরী। উদীয়মান পরাশক্তি চীন বাংলাদেশের অন্যতম সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহকারী, তাকে ইচ্ছা করলেই পাশ কাটানো সম্ভব নয়। প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে '৭৫ সালের পর থেকেই সম্পর্ক শীতল। হাসিনা সরকার এ বৃহৎ প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেয়। এ উদ্যোগ-ই ছিল পররাষ্ট্র নীতির একটি মৌলিক পরিবর্তন। রাশিয়া এবং উত্তর কোরিয়ার নিকট থেকে সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় একটি বড় পরিবর্তন। এ দু'টি পরিবর্তন ছাড়া আওয়ামী লীগকে তার বিপরীতধর্মী আদর্শের পূর্বসূরীদের পথ-ই অনুসরণ করতে হয়েছে।

ভারতের সঙ্গে একটি লম্বা সময় ধরে বাংলাদেশের সম্পর্ক ছিল বৈরী ও শীতল। আওয়ামী লীগ যে নীতি পরিহার করে সম্পর্ক উষ্ণ করার উদ্যোগ নেয়, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বেশ কিছু দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা দীর্ঘ সময় ধরে সমাধান করা যায় নি। এর ফলে দু'দেশের সম্পর্ক দিন দিন আরো শীতল হয়েছে। দু'দেশের ভেতর-সু-প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক না থাকায় '৭৫

www.pathagar.com

সালের পর থেকে '৯৬ সালের আগ পর্যন্ত তথা আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পূর্ব পর্যন্ত দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা রয়েই গেছে। সরকার গঠনের পর ভারতের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিবদমান সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয় আওয়ামী লীগ। তাদের এ নীতি সময়োপযোগী এবং ইতিবাচক ছিল। বাংলাদেশ পানি সমস্যা, চাকমা সমস্যা, সীমান্ত চিহ্নিতকরণ সমস্যা প্রভৃতি নিয়ে দীর্ঘদিন ভুগছিল। এসব সমস্যা সমাধানে আওয়ামী লীগ বড় ধরনের সাফল্য দেখাতে পেরে তাদের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে মাইলফলক তৈরি করেছে।

ঐতিহাসিক কারণেই আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক উষ্ণ করার সুযোগ বিদ্যমান ছিল। সরকার গঠনের পর থেকে সত্যিকারের সদিচ্ছার কারণে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক উষ্ণতার পর্যায়ে নিতে সক্ষম হয় আওয়ামী লীগ সরকার। তারা দ্বি-পাক্ষিক প্রধান সমস্যাগুলোকে চিহ্নত করে অগ্রসর হয়। এর ভেতর প্রধান দু'টি সমস্যা ছিল গঙ্গার পানি বন্টন এবং উপজাতীয় বিদ্রোহ সংক্রান্ত। দু'টিই সমাধানে সক্ষম হয় তারা।

ফারাক্কা বাঁধের কারণে গঙ্গার পানি বন্টন নিয়ে দীর্ঘদিন দরবার চলে আসছিল ভারত-বাংলাদেশের ভেতর। পানির ন্যায্য হিস্যা পাওয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত ছিল। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারের সময় যে স্বল্প মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তা ছিল অপ্রতুল ও ক্ষণস্থায়ী সমাধান, যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করেই আওয়ামী লীগ এ সমস্যার সমাধানে ব্রতি হয়। জুলাই মাসে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব সালমান হায়দার ঢাকায় আসেন। তার সফরের সময় বিষয়টি নতুন করে উত্থাপিত হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব ফারুক সোবহান আগস্টের ৬ তারিখে ফিরতি সফরে দিল্লি গেলে শুষ্ক মৌসুমের আগেই গঙ্গার পানি বন্টন নিয়ে একটি চুক্তির বিষয়ে আশাবাদ উভয়পক্ষ থেকেই ব্যক্ত করা হয়। সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয় মন্ত্রী পর্যায়ের যোগাযোগ। ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আই. কে. গুজরাল সেপ্টেম্বরের ৬-৯ তারিখে বাংলাদেশে অবস্থানকালে প্রধানমন্ত্রী সহ বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করেন। আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিল পানি বন্টন। বাংলাদেশের নিকট প্রতীয়মান হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা বড় ভূমিকা পানি-বন্টনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান। এর আগে জিয়াউর রহমানের সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের ওপর দারুণ চাপ দিয়েছিল কলকাতা বন্দরের প্রয়োজনীয় স্বার্থরক্ষার বিষয়ে। সুতরাং নতুন কোন চুক্তির সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার বন্দরের প্রশ্নটি সামনে নিয়ে কেন্দ্রের ওপর চাপ প্রয়োগে পানি বন্টনের প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টির আশঙ্কা ছিল। বাংলাদেশ সেজন্য আগে থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নেয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসুর সঙ্গে ১৭ সেপ্টেম্বর

www.pathagar.com

কলকাতায় গিয়ে আলোচনা করে পানি বন্টন প্রক্রিয়ায় তাকে পরোক্ষভাবে শামিল করতে সক্ষম হন। ঐ মাসেই ২৭-২৮ তারিখে দিল্লিতে বিশেষজ্ঞদের বৈঠক হয়। আরো অন্তত দু'দফা মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠকের পর ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসের ১০-১২ তারিখে শেখ হাসিনার ভারত সফরের শেষ পর্যায়ে ১২ তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড় এবং হাসিনা কাঙ্ক্ষিত পানি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ৩০ বছর মেয়াদী চুক্তি পানি বন্টন সমস্যার একটি দীর্ঘস্থায়ী সমাধান ঘটাতে সক্ষম হয়।

চুক্তিটিতে ১২টি অনুচ্ছেদ বিদ্যমান। অনুচ্ছেদগুলোতে পানি বন্টনের এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করে দেয়া আছে। বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষায় এটি লিখিত হয়ে স্বাক্ষরিত হলেও কোন জটিলতার ক্ষেত্রে ইংরেজি পাঠের প্রাধান্য দেয়ার কথা বলা হয়েছে। চুক্তি অনুসারে ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত শুকনো মওশুম ধরে ১০ দিনের এক-একটি মেয়াদ হিসেবে পানি বন্টনের কথা বলা হয়েছে।

একনজরে প্রাপ্য পানির হিস্যা হচ্ছে

ফারাক্কায় পানির প্রাপ্যতা	ভারতের অংশ	বাংলাদেশের অংশ
৭০,০০০ কিউসেক বা কম	৫০%	৫০%
৭০,০০০/৭৫,০০০ "	অবশিষ্ট প্রবাহ	৩৫,০০০ কিউসেক
৭৫,০০০ কিউসেকের বেশি	৪০,০০০ কিউসেক	অবশিষ্ট প্রবাহ

১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন জরিপের মাধ্যমে পানি প্রবাহের গড় মাত্রাকে হিসেবে নিয়ে ঐ বণ্টন করা হয়েছে।

পানি চুক্তি হবার পর দেশে এ নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা-সমালোচনা হয়। অনেকে এমন একটি চুক্তি করতে পারার জন্য আওয়ামী লীগ সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ; আবার অনেকে চুক্তি যথাযথ হয়নি, এতে গ্যারান্টি ক্লজ নেই মর্মে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু চুক্তি অনুসারে ১ মার্চ থেকে ১০ মে পর্যন্ত ১০ দিন অন্তর ১০ দিন করে বাংলাদেশ এবং ভারতকে নূন্যতম ৩৫,০০০ কিউসেক পানির নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। তবে চুক্তি পুরো পালনের বিষয়ে ভারতের গাফিলতি লক্ষ্য করা গেছে। চুক্তি পরবর্তীতে পানির সম্পূর্ণ হিস্যা বাংলাদেশ পায়নি অভিযোগ বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে অনেকটাই সমর্থিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারি পর্যায়ে এ নিয়ে দেন-দরবার করেছে।

অন্য যে বড় সমস্যাটি আওয়ামী লীগ সরকার দূর করতে সক্ষম হয়েছে তার শাসনামলে, তা হচ্ছে, পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় সমস্যা। ক্ষমতাসীন হয়েই আওয়ামী লীগ সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়। তাদের জন্য অন্য সরকারগুলোর

www.pathagar.com

তুলনায় এ বিষয়ে সুবিধা ছিল অধিক। এরশাদের আমল থেকেই উপজাতীয় সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছিল। পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন, আলাদা প্রশাসনিক সুবিধা প্রদান, উন্নয়ন তৎপরতা প্রভৃতি। খালেদা জিয়ার সময় শান্তিবাহিনীর নেতৃত্বের সঙ্গে সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে আলোচনা করে পরিস্থিতি আরো ইতিবাচক হয়। অনেক উদ্বাস্তুও সেই সময় ফিরে আসে, তা আগেই বলা হয়েছে। মোট কথা, একটি সমাধানে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ বেশ ইতিবাচক অবস্থানে ছিল। উপজাতিরাও দীর্ঘ আলোচনা ও সংগ্রামের নিষ্ফলতার পর অনেকটা নমনীয় হয়ে এসেছিল।

চট্টগ্রামের উপজাতীয় সমস্যা সমাধান আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মেনিফেস্টাতে ছিল। তাছাড়া দেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক স্বার্থে সমস্যাটির দ্রুত নিষ্পত্তি জরুরী ছিল। প্রতিদিন পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। প্রাণহানির পরিমাণ সামরিক-বেসামরিক মিলে প্রায় ২০,০০০। বিপুল পর্যটন সম্ভবনা সহ অর্থনৈতিক সম্ভবনায় যে ক্ষতি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং আওয়ামী লীগ দ্রুত উদ্যোগ নেয় সমাধানের।

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সালে গঠিত হয় পার্বত্য সমস্যা বিষয়ক জাতীয় কমিটি। ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির প্রধান হন জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ। এর ভেতর ছিলেন চট্টগ্রামের মেয়র, সংসদ সদস্য, বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের মানুষ।

২১-২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালে সন্তু লারমা বা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বাধীন শান্তিবাহিনীর সঙ্গে জাতীয় কমিটির প্রথম দফা বৈঠক হয়। দীর্ঘ এক বছরের বেশি সময়ে ৭ দফা আলোচনার পর ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার এবং শান্তি বাহিনীর ভেতর চুক্তি হয়।

চুক্তিতে আঞ্চলিক কাউন্সিল গঠন, পাহাড়িদের বিভিন্ন অধিকার সংরক্ষণ করা সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে চুক্তিতে সংবিধান বিরোধী, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিরোধী কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়নি মর্মে বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন।

১৯৯৭ সালে চুক্তি সম্পাদিত হবার পর উপজাতীয় বিদ্রোহীরা যেমন অস্ত্র সমর্পণ করে, তেমনি সকল উদ্বাস্তু ফিরে আসে দেশে। বলা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় সমস্যার যবনিকাপাত ঘটে। কিন্তু চুক্তি পরবর্তী সময়ে কিছু জটিলতার উদ্ভব হয়। দেশের সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এ চুক্তিকে স্বাধীনতার প্রতি হুমকি, আঞ্চলিক অখণ্ডতা বিনষ্টের অভিযোগ সহ বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেন। এমন কি চুক্তিকারী উপজাতীয় নেতৃবৃন্দও সরকারের বিরুদ্ধে চুক্তি যথাযথ পালন না করার অভিযোগ আনেন।

www.pathagar.com

চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত কূটনৈতিক সাফল্যের তুলনায় ঐসব অভিযোগ মামুলি বিষয় এবং সময়ের সঙ্গে সমাধান হয়ে যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। উপজাতীয় সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারা আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য অত্যন্ত বড় কূটনৈতিক সাফল্য ছিল। রাজনৈতিকভাবে এ সমস্যার সমাধান করতে পারা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। ঐ প্রধান দু'টি সমস্যার সমাধান হলেও ভারতের সঙ্গে আরো কিছু সমস্যা শেষ পর্যন্ত থেকেই গিয়েছিল, যা সমাধান করা যায়নি। সীমান্ত সমস্যা এর ভেতর প্রধানতম। আগেই বলা হয়েছে, দু'দেশের ভেতর সম্পূর্ণ সীমান্ত চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। এমন কি '৭৪ সালের ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির পরও না। সুতরাং দু'দেশের ভেতর সীমান্ত নিয়ে সমস্যা-সংঘর্ষ নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হলে ভারতের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্কের পেক্ষাপটে সীমান্ত সমস্যার সমাধান হবে, এমন আশা করা গেলেও তা হয়নি। বরং পূর্বের মতই সংঘর্ষ উত্তেজনা বহাল ছিল। আওয়ামী শাসনের শেষদিকে পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। ২০০১ সালের ১৬ এপ্রিল সিলেটের প্রতাপুর সীমান্তের পাদুয়া বিডিআর দখল করে নেয়। বাংলাদেশের দাবি ঐ ভূখন্ড তাদের। ভারত ত্রিশ বছর ধরে সেটি দখলে রেখেছে। সঠিকভাবে সীমানা চিহ্নিত না হওয়ায় দু'দেশের ভেতর বিরোধ দেখা দেয়। ১৮ এপ্রিল ২০০১ সালের ভোররাতে বিএসএফ বা ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে হামলা চালায়। ভারী অস্ত্র সজ্জিত বিএসএফ এর আক্রমণের মুখে বিডিআর সীমান্ত রক্ষায় পাল্টা হামলা চালায়। সীমান্ত সংঘর্ষে মোট ১৬ জন আক্রমণকারী বিএসএফ এবং ২ জন বিডিআর নিহত হন। একাধিক বিএসএফ সদস্য গ্রেফতারও হয়। দু'পক্ষের তীব্র উত্তেজনা, বাদানুবাদের পর বিষয়টি কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে সুরাহা করা হয়। তবে এমন ঘটনার পর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক হঠাৎ করেই জটিলতার ভেতর পড়ে এবং বাংলাদেশের ওপর ভারতের দিক থেকে প্রচণ্ড চাপের সম্মুখীন হতে হয়। সমস্যার সমাধান হলেও বাংলাদেশকে পাদুয়া ছেড়ে আসতে হয়েছে। রৌমারী এবং পাদুয়ার ঘটনা নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের ভূমিকা বিভিন্ন পর্যায়ে বেশ সমালোচিত হয়েছে। ভারতের নিকট বাংলাদেশের বলিষ্ঠতার অভাবের কথাও বলা হয়েছে । স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জানিবুল হকের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে সীমান্ত চিহ্নিত করার বিষয় নিয়ে কয়েক দফা আলোচনার পরও সফলতা পায়নি। চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ, দু'দেশের বাণিজ্য ঘাটতির বিপুলত্ব সহ আরো অনেকগুলো দ্বিপাক্ষিক সমস্যা শেষ পর্যন্ত থেকেই গেছে। তবে প্রধান দুটি সমস্যার সমাধান করতে পারা আওয়ামী লীগের জন্য বড় ধরনের কূটনৈতিক সাফল্য ছিল। তবে ট্রানজিট, এশিয়ান হাইওয়ে ইত্যাদি নিয়ে দু'দেশে বিতর্ক হয়েছে।

www.pathagar.com

চীনের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকার তার পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। মুখ্যত সামরিক বিষয়াদির আদান-প্রদানই বাংলাদেশের সঙ্গে বেশি বহাল ছিল পূর্বের মত। বাণিজ্য আওয়ামী লীগ আমলে নতুন করে বাড়েনি। তবে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বহাল রাখা আওয়ামী লীগের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। হাসিনা সরকার এ পর্যায়ে একটি ব্যতিক্রম দেখাতে পরেছিলেন; ভারত ও তার পূর্ব ইউরোপের মিত্রদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক এবং চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এক-ই সঙ্গে বহাল রাখতে পারয়া। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এমনটি আর কখনো সম্ভব হয়নি। সব সরকারকেই চীন ও পশ্চিমা বিশ্ব অথবা ভারত ও তার পূর্ব ইউরোপের মিত্রদের যে কোন এক পক্ষকে বেছে নিতে হত। আওয়ামী লীগ সরকারকে সেটি করতে হয়নি। এতে আওয়ামী লীগের কূটনৈতিক সফলতা ছিল নিশ্চয়ই; তবে নেপথ্যে আরো কারণ ছিল। স্নায়ুযুদ্ধের অবসান এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতনের ফলে পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিরোধ বিলুপ্ত হয়। এক-ই সঙ্গে চীন ও ভারতের দীর্ঘদিনের বিরোধ এ সময় অনেক কমে আসে। সুতরাং পরস্পর বিরোধী পক্ষগুলোর সঙ্গে এক-ই সময়ে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা সহজ হয়েছিল। এমনি উদ্যোগ দক্ষ কূটনৈতিক তৎপরতার সাক্ষ্য বহন করে। চীনের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক এবং সামরিক সরঞ্জমাদি সংগ্রহের নীতি বহালে রেখে আওয়ামী লীগ সরকার অস্ত্র সংগ্রহের নতুন উৎসের দিকে ঝুঁকে যায়। এটিকে পররাষ্ট্র নীতির নতুন মেরুকরণ না বলা গেলেও নতুনত্বের ইঙ্গিতবহ বলা যায়। দীর্ঘদিনের শীতল সম্পর্কের পর্দা ছেদ করে আওয়ামী লীগ রাশিয়ার নিকট থেকে বিমান বাহিনীর জন্য বহুল আলোচিত মিগ-২৯ বিমান ক্রয় করে ৮টি। উত্তর কোরিয়ার নিকট থেকে ক্রয় করে নৌবাহিনীর জন্য ফ্রিগেট। '৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর এমনি উদ্যোগ এই প্রথম। এতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ তার সমরাস্ত্রের জন্য মুখ্যত চীন এবং আংশিকভাবে পশ্চিমা বিশ্বের ওপর নির্ভরশীল ছিল। অন্যকোন সূত্রের কথা তারা বৈশ্বিক রাজনীতির কারণে চিন্তাই করতে পারত না। আওয়ামী লীগ পরিবর্তিত বৈশ্বিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ভিন্ন চিন্তার সুযোগটি কাজে লাগিয়েছে। দেশে-বিদেশে এ সিদ্ধান্ত ব্যাপক আলোচিত-সমালোচিত হয়েছে। তবে অস্ত্রের নতুন উৎস ব্যবহারকে নতুন সুযোগকে কাজে লাগানোর দক্ষতা হিসেবে না দেখে উপায় নেই।

বৈশ্বিক রাজনীতির বর্তমান বাস্তবতায় হাসিনা সরকারে, ৭৫ পরবর্তীতে তৈরি পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে হলেও তারা যে নীতি ও আদর্শের দিক থেকে পূর্বসূরীদের থেকে ভিন্ন, তা প্রমাণ হয়ে যায় পশ্চিমা বিশ্ব, মধ্যপ্রাচ্য, চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর রাখার পাশাপাশি ভারত, রাশিয়া, উত্তর কোরিয়ার মত দেশগুলো সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের ভেতর দিয়ে। বাংলাদেশের

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক প্রয়োজন, নিরাপত্তা, বিশ্ব-রাজনীতি সহ নানা কারণে '৭৫ সালের পর পশ্চিমা ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি গড়ে ওঠে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পূর্ব পর্যন্ত ঐ নীতিই কঠোরভাবে অনুসৃত হয়েছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে বাস্তব কারণে '৭৫ পরবর্তী ঘরানা থেকে সরে যেতে পারেনি। তবুও যতটা সম্ভব, পুরনো মিত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলার চেষ্টা তারা করেছেন এবং এতে করে বাংলাদেশের সামনে পররাষ্ট্র নীতির নতুন একটা কৌশল অনেকটাই উন্মোচিত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এবং তার মিত্রদের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ১৯৭৫ সালের পর থেকে একরকম নিরবিচ্ছিন্নভাবেই ভাল। আওয়ামী লীগ আমলেও এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজন, এককেন্দ্রিক বিশ্বে দেশের নিরাপত্তা, বিশ্ব রাজনীতিতে দেশের স্বার্থ সবকিছু মিলিয়ে পশ্চিমা ঘেঁষা নীতি অনুসরণের কোন বিকল্প নেই। আওয়ামী লীগ সরকারকেও ত-ই করতে হয়েছে। তাদের কৃতিত্ব এখানে যে, তারা পশ্চিমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি ভারত, রাশিয়া, উত্তর কোরিয়ার মত দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক অনেকটা স্বাভাবিক করতে সক্ষম হন। ইতোমধ্যেই বিষয়টি ব্যাখ্যাত হয়েছে।

জাপান বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের নিকটতম সাহায্যকারী এবং উন্নয়ন মিত্র। ৫বছরে দেশটির সঙ্গে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা গ্রহণের ক'মাসের ভেতরেই জাপান সফর করেন।

জাপান ছাড়াও অন্য পুঁজিবাদী মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল। তেমন কোন আলোচনার মত উত্থানপতন লক্ষ্য করা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘদিন ধরে এসব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ধারাবাহিকভাবে উষ্ণ এবং স্থিতিশীল। আওয়ামী লীগ সরকারও তা বহাল রাখতে সক্ষম হন।

শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হয়ে, ৯৬ সালের অক্টোবরে জাতিসংঘের ৫১তম অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্র যান। তখন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ক্লিন্টনের সঙ্গেও আলোচনা করেন। এতে বাংলাদেশ-মার্কিন সম্পর্ক যেমন ভাল হয়, তেমনি নতুন সরকারের নিকট মার্কিনীদের প্রয়োজনীয়তা প্রমানিত হয়। শেখ হাসিনা এর পরও একাধিকবার আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেছেন। বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক হাসিনা সরকারের ৫ বছরে ঘনিষ্ঠই থেকেছে; আরো সম্প্রসারিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিষয়াদি নিয়ে দু'দেশ শুধু ফিলিস্তিন সমস্যা ছাড়া অন্য সব ইস্যুতে এক-ই সমান্তরালে অবস্থানের দীর্ঘদিনের নীতিই শেখ হাসিনার সময়েও বহাল থেকেছে। বাংলাদেশ মার্কিন সম্পর্কের চূড়ান্ত নিদর্শনটি দেখা গেছে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টনের বাংলাদেশ সফরের ভেতর দিয়ে। ২০০০ সালের মার্চ মাসের ২০ তারিখে ১২ ঘন্টার সফরে তিনি বাংলাদেশে আসেন। ঐ সময় ক্লিনটন দক্ষিণ এশিয়ার ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ সফরে

www.pathagar.com

এসেছিলেন। বাংলাদেশে তার সফর ছিল আন্তরিকতাপূর্ণ, যদিও এ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। নিরাপত্তাজনিত কারণে স্মৃতিসৌধে না গিয়ে সমালোচনার শিকার হয়েছেন তিনি। সরকারি দল, বিরোধী দল সহ বিভিন্ন পর্যায়ে তার আলোচনা ও দেশের অভ্যন্তরে সেসব নিয়ে প্রতিক্রিয়া থেকে দেশের ওপর মার্কিনীদের প্রভাব পরিষ্কারভাবে অনুভূত হয়েছে।

ক্লিন্টনের বাংলাদেশ সফর নিঃসন্দেহে আওয়ামী লীগ সরকারের কূটনৈতিক সফলতার নিদর্শন। বিশেষ করে রাশিয়া এবং উত্তর কোরিয়া থেকে অস্ত্র ক্রয়ের প্রেক্ষাপটে ঐ সফর দক্ষ কূটনীতির সাক্ষ্য বহন করে। অর্থনৈতিক দিক থেকে দু' দেশের সম্পর্ক অল্প কিছু জটিলতা ছাড়া মোটামুটি সাবলীল গতিতে এগিয়েছে। বাংলাদেশে মার্কিন পুঁজি আকর্ষণের চেষ্টাও করেছেন যথাসাধ্য। জ্বালানি সেক্টরে কিছু বিনিয়োগ মার্কিন কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে পাওয়াও গেছে।

মধ্যপ্রাচ্যের তথা মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকার তার পূর্ব সূরীদের মতই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছে। দু'পক্ষের সম্পর্ক ছিল স্থিতিশীল। শুধু পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বেশ কিছুটা জটিলতায় পড়ে পাকিস্তানে সেনাশাসন জারির পর। এছাড়া দু'দেশের সম্পদ ভাগ এবং আটকে পড়া পাকিস্তানীদের প্রত্যাবাসন নিয়ে জটিলতার সুযোগ তো ছিলই। জাতিসংঘে শেখ হাসিনা তার ভাষণে সেনাশাসনের কঠোর সমালোচনা করলে ঐ জটিলতার সূত্রপাত হয়। সেনাশাসক পারভেজ মোশাররফ বিষয়টিকে সহজভাবে নিতে পারেন নি। যদিও বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের অবস্থান নৈতিকভাবে সমর্থিত হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত তেমন মারাত্মক কোন কূটনৈতিক সমস্যা দুই দেশের ভেতর তৈরি হয়নি।

বিশ্ব শান্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিল। বিভিন্ন স্থানে জাতিসংঘের শান্তি প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ তার সেনাবাহিনীকে নিয়োজিত করার নীতি বহাল রেখেছে। সোচ্চারভাবে বিশ্বশান্তির পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। উপআঞ্চলিক জোট গঠনের প্রক্রিয়ায়, জি-৮ জোট গঠনে অংশগ্রহণ, বিশ্ব ক্ষুদ্রঋণ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগদান ও বাংলাদেশকে পরবর্তী সম্মেলস্থল হিসেবে স্বীকৃতি আদায় সহ বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশ জোরালো ভূমিকা রেখেছে। তবে বাংলাদেশের প্রার্থীর কমনওয়েলথ মহাসচিব পদে ভরাডুবি কূটনৈতিক অদক্ষতার পরিচায়ক বলে পর্যবেক্ষকরা মত দিয়েছেন। বিশেষ করে এশিয়ার একমাত্র প্রার্থী হিসেবে বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও পরাজিত হওয়া পর্যবেক্ষকদের অবাক করেছে। মানবাধিকার রিপোর্টের বিরূপ মন্তব্য এবং শাসনামলের শেষদিকে ট্রান্সপারেন্সি রিপোর্টে বিশ্বের শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়াটা আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি অনেক ক্ষুণ্ন করেছে।

www.pathagar.com

উপসংহার

স্বাধীনতা উত্তর ত্রিশ বছরে বাংলাদেশ তার বিদেশ নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েছে। বৈশ্বিক রাজনীতির জটিলতাও তাকে মোকাবেলা করতে হয়েছে। অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং জাতীয় নিরাপত্তার মত অতিপ্রয়োজনীয় নিয়ামকগুলোর সক্রিয় প্রভাব পররাষ্ট্রনীতির গতি নির্ধারণ করেছে বিগত সময়ে। স্নায়ু-যুদ্ধের সময়কার রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করেছে অনেকটা। **বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষিত এবং বাংলাদেশের প্রয়োজন তার পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন পর্যন্ত ঘটিয়েছে।** বাংলাদেশ তার মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলের শেষদিক পর্যন্ত পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে যে পথে চালিত হয়েছে, অবস্থার প্রেক্ষিতে তাকে দ্রুত সেই পথ থেকে সরে আসতে হয়েছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে স্পষ্ট দু'টি ধারা বিদ্যমান। প্রথম ধারাটির সময়কাল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে শেখ মুজিবের শাসনামলের শেষ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ধারাটি মুজিব উত্তর সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় থেকে মুজিব আমলের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ভারত এবং তার মিত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে। স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের অবস্থান তো বটেই; সেই সঙ্গে তার মিত্রদের অবস্থানও দারুণভাবে ইতিবাচক হওয়ায় স্বাধীনতার পর বেশ ক'বছর বাংলাদেশ ভারত-সোভিয়েত অক্ষেই অবস্থান করেছিল। কিন্তু এটি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৭৫ সালের মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের পর নতুন শাসকরা এক রকম রাতারাতি পশ্চিমা ব্লকে যোগ দিয়ে ফেলেন। যোগদানের পর-ই শুরু হয় দ্বিতীয় ধারার পররাষ্ট্রনীতি, যা আজ অবধি অব্যাহত আছে। পশ্চিমারা দ্রুত পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছিল। তবে এখানে বলা দরকার, শাসনামলের একদম শেষদিকে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে শেখ মুজিবও পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলো এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। সেজন্য পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মত দাবি থেকেও তিনি পিছু হটেছিলেন। মুজিব চেষ্টা করছিলেন ভারত-সোভিয়েত অক্ষের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক অব্যাহত রেখে অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের। এ প্রচেষ্টার সফলতা আংশিক। মুজিবপরবর্তী সরকারগুলোর পশ্চিমা ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতির পেছনে পরিষ্কার দু'টি কারণ বিদ্যমান ছিল। প্রথমতঃ অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানো এবং দ্বিতীয়তঃ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো এবং পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের চেষ্টা মুজিব আমলের শেষ থেকেই চলছিল এবং পরবর্তীদের জন্যও তা জরুরী ছিল– এটি সহজে বোধগম্য। কিন্তু নিরাপত্তা বিষয়টি একটু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। মুজিব হত্যাকাণ্ডের পর প্রতিষ্ঠিত সরকার ভারত-সোভিয়েত রোষের ভয়ে আতঙ্কিত ছিল এবং তাদের শাসনামলে

www.pathagar.com

জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা ছিল। সুতরাং চীন, পশ্চিমা বিশ্ব এবং মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলে পরবর্তী সরকারগুলো নিরাপত্তা ও স্বীকৃতি নিশ্চিতের পথ ধরেছিল।

শুরু থেকেই বাংলাদেশের ঘোষিত অবস্থান ছিল জোটনিরপেক্ষতার দিকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ অবস্থান শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পারেনি। বৈশ্বিক রাজনীতির কারণে অনানুষ্ঠানিকভাবে তাকে কোন না কোন পক্ষ নিতেই হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানের সময় বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ের সরকারগুলো ঘোষিত জোটনিরপেক্ষতায় অবস্থান বহাল রেখেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পুঁজিবাদীদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল।

বাংলাদেশ দরিদ্র দেশ হওয়ায় তাকে অর্থনৈতিক প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিতে হয়েছে। সেজন্য মধ্যপ্রাচ্য এবং পুঁজিবাদী দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গোড়া থেকেই করা হচ্ছিল। বাংলাদেশ যে পররাষ্ট্রনীতি সব সময়-ই অনুসরণ করেছে, সেটির মোদ্দাকথা অর্থনৈতিক অর্জন হওয়ায় একে বিশেষজ্ঞরা অর্থনৈতিক কূটনীতি বলে অবিহিত করেছেন।

শেখ মুজিবুর রহমান যে পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেছেন, ১৯৭৫ পরবর্তীতে তা বদলে জিয়া সরকারের আমলে সম্পূর্ন ভিন্ন নীতিতে পরিণত হয়। পরবর্তী সরকার গুলো জিয়া প্রতিষ্ঠিত পররাষ্ট্রনীতিই অনুসরণ করেছেন। এরশাদ বা খালেদা জিয়া সরকারের পররাষ্ট্রনীতির মূলসুর জিয়ার পররাষ্ট্রনীতির-ই অনুরূপ ছিল। হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণ করে পূর্বসূরীদের পররাষ্ট্রনীতি থেকে সরতে পারেন নি। তার অবশ্য বিকল্পও ছিল না। তবে এর ভেতর, ভারতের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক, রাশিয়া এবং উত্তর কোরিয়া থেকে অস্ত্র ক্রয়ের বিষয়টি বিশেষ উল্লেখ করার মত ঘটনা। কেনন,া এদের সঙ্গে অন্য সরকারগুলোর সম্পর্ক ছিল খুব-ই শীতল।

স্নায়ু-যুদ্ধের অবসান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে দেশের জন্য বিকল্প খোঁজার সুযোগ আর রইল না। এককেন্দ্রিক বিশ্বে তাকে অবশ্যই মার্কিন পক্ষপুটে থাকতে হচ্ছে। তবে ভারতের দ্রুত আঞ্চলিক পরাশক্তি হয়ে উঠা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতদিন চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে আঞ্চলিক রাজনীতিতে নিজের অবস্থান নির্ণয় করেছে বাংলাদেশ। কিন্তু এখন ভারতের বিষয়টিও তাকে জোরালোভাবে ভাবতে হবে। শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উষ্ণ করে সেই পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

(১) A A K Niazi (Lt. Gen.), The Betrayal of East Pakistan, (Delhi: Oxford University Press,1990)

(২) A M A Muhith, American Response to Bangladesh Liberation War, (Dhaka: upl,1996)

(৩) A M A Muhith, *Bangladesh Emergence of A Nation* (Dhaka: upl,1992)

(৪) Akbar Ali Khan, *Discovery of Bangladesh, Explorations in to Dynamics of a Hidden Nation*, (Dhaka: upl,2001)

(৫) Amena Mohsin, *The Politics of Nationalism the Case of the Chittagong Hill Tracts Bangladesh*, (Dhaka: upl, 1997)

(৬) Asoka Raina, *Inside RAW, the Story of Indian's Secret Service*, (New Delhi: Vikas Publishing House Pvt, Ltd. 1981)

(৭) Ben Crow with Alan Lindquist and David Wilson, *Sharing The Ganges, The Politics and Technology of River Development*, (Dhaka: upl, 1995)

(৮) Dan Haendel, *The Process of Priority Formulation, us Foreign Policy in the Indo-Pakistan War of 1971*, (Colorado: Westvie press, 1977)

(৯) Emajudddin Ahamed (ed.), *Foreign Policy of Bangladesh, a Small States Emperative*, (Dhaka: upl,1984)

(১০) Emajuddin Ahamed (ed.), *Bangladesh Politics*, (Dhaka: Centre for Social Studies, 1980) ,

(১১) Emajuddin Ahamed and Abul Kalam, *Bangsadesh, South Asia and the World*, (Dhaka: Academic Publishers, 1992) .

(১২) Fakhruddin Ahamed, *Critical Times, Memoirs of a South Asian Diplomat*, (Dhaka: upl, 1994)

(১৩) Golam Hossain, *General Ziaur Rahman and the BNP, Political Transformation of a Military Regime*, (Dhaka: upl, 1988)

(১৪) Golam Mostafa, *National Interest and Foreign Policy, Bangladesh's Relations with Soviet Union and its Successor States*, (Dhaka upl,1995)

(১৫) Gul Hassan Khan (Lt. gen.), *Memoirs*, (Delhi: Oxford University Press, 1993)

(১৬) G W Choudhury, *The Last Days of Unitd Pakistan*, (Dhaka: upl,1998)

(১৭) Henry Kissinger, *White House Years*, (Boston : Little, Brown and Company, 1979) .

(১৮) Imtiaz Ahmed, *State and Foreign Policy, India's Role in South Asia*, (Dhaka: Academic Publishers, 1998)

(১৯) Jaglul Alam, *Emergence of Bangladesh and Big power Role in 1971* (Dhaka: Progoti Prokashani,1990)

(২০) James J Novak, *Bangladesh, Reflections on the Water*, (Dhaka: upl,1994)

(২১) J F R Jacob (Lt. Gen.), *Surrender At Dacca. Birth of A Nation*, (Dhaka: upl, 1998)

(২২) J N Dixit, *Libaration and Beyond, Indo-Bangladesh Relations*, (Dhaka: upl 1999)

(২৩) Just Faaland and J R Parkinson, *Bangladesh: The Test Case of Development*, (London: C. Hurst and company,1976)

(২৪) Lawrenec Lifsehultz, Bangladesh : *The Unfinished Revolution*, (London: Zed press, 1979) .

(২৫) Lawrence Ziring, Bangladesh. *From Mujib to Ershad. An Interpretive Study*, (Dhaka: upl, 1994)

www.pathagar.com

(২৬) Martin Smith, *Burma, Insurgency and the Politics of Ethnicity*, (Dhaka: upl 1999)

(২৭) M G Kabir and Shaukat Hassan (eds), *Issues and Challenge Facing Bangladesh Foreign Policy*, (Dhaka: Bangladesh Society of International Studies, 1989)

(২৮) M G Quibria, *The Bangladesh Economy in Transition*, (Dhaka: upl1997)

(২৯) Moudud Ahmed, *Bangladesh: Constitutional quest for Autonomy*, (Dhaka: upl, 1979)

(৩০) Moudud Ahmed, *Democracy and the Challenge of Development, A Study of Politics and Military Interventions in Bangladesh*, (Dhaka: upl,1995)

(৩১) Muhammad Shamsul Huq, *Bangladesh in International Politics, The Dilemmas of the Weak States*, (Dhaka: UPL, 1995)

(৩২) Muhammad Shamsul Huq, *Chowdhury Rafiqul Abrar, Aid Development and Diplomacy, Need for an Aid Policy* (Dhaka: upl1999).

(৩৩) Muhammad Yunus with Alan Jolis, *Banker to the poor*, (Dhaka: upl,1987)

(৩৪) Nurul Momen, *Bangladesh in the United Nations, A Stady in Diplomacy* (Dhaka: UPL,1987)

(৩৫) Rahman Sobhan, *The Crisis of External Dependence, the Political Economy of Foreign Aid to Bangladesh* (Dhaka: upl,1992)

(৩৬) Rounoq Jahan, *Bangladesh Politics: Problems and Issues*, (Dhaka: upl,1980)

(৩৭) Sharif Uddin Ahmed (ed.), *Dhaka, Past Present Future*, (Dhaka: The Asiatic Society of Bangladesh,1991)

(৩৮) Shireen Hasan Osmany, *Bangladesh Nationalism, History of Dialectics and Dimensions*, (Dhaka: upl, 1992)

(৩৯) Shwe Lu Maung, *Burma, Nationalism and Ideology and Analysis of Society Culture and Politics*, (Dhaka: upl, 1989)

(৪০) Siddeq Salik, Witness to Surrender, (Dhaka: upl 1997)

(৪১) S M Burke, *Pakistan's Foreign policy: A Historical Analysis*, (London: Oxford University Press, 1973)

(৪২) Syed Anwar Husain, *War and Peace in the Chittagong Hill Tracts, Retrospect and Prospect*, (Dhaka: Agamee prakashani, 1992)

(৪৩) Talukdar Maniruzzaman, *Group Interests and Political Changes Studies in Bangladesh and Pakistan* (New Delhi: South Asian Publishers, 1982)

(৪৪) Talukdar Maniruzzaman, *Politics and Security of Bangladesh* (Dhaka: upl, 1994)

৪৫. Zillur Rahman Khan, *Martial Law To Martial Law, Leadership Crisis in Bangladesh*, (Dhaka: upl, 1984)

৪৬. Zulfiqar Ali Bhutto, *The Great Tragedy* (pakistan: People's party publications,1971)

৪৭. অজয় রায়, *আদি বাঙালি নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭)

৪৮. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতিঃ ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫* (ঢাকাঃ উল্লেখ নেই)

৪৯. অংশুমান আচার্য, *ভারতীয় সংবিধানের কয়েকটি দিক* (কলকাতাঃ আনন্দ, ১৯৮৩)

৫০. অং সান সুচি, *ভয় হতে অভয় পথে ও অন্যান্য রচনা* (ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯২)

৫১. *আজকের জাতিসংঘ* (ঢাকাঃ উল্লেখ নেই, ১৯৮৩)

www.pathagar.com

৫২. আতিউর রহমান, *সার্কঃ রাজনৈতিক অর্থনীতি* (ঢাকাঃ ইউপিএল ১৯৮৫)
৫৩. অ্যান্থনী ম্যাসকারেন্‌হাস, *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ* (ঢাকাঃ পপুলার পাবলিশার্স, ১৯৮৫)
৫৪. অ্যান্থনি ম্যাসকারেন্‌হাস, *বালাদেশ রক্তের ঋণ* (ঢাকাঃ হাক্কানী পাবলিশার্স-১৯৯৭)
৫৫. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার-দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* (ঢাকাঃ খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৮৫)
৫৬. আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি* (ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯৭)
৫৭. আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, *বঙ্গভবনে শেষ দিনগুলি* (ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯)
৫৮. এম আর আখতার মুকুল, *আমি বিজয় দেখেছি* (ঢাকাঃ সাগর পাবলিশার্স, সন উল্লেখ নেই)
৫৯. এইচ জি নিকোলাস (অনুবাদ শেখর ঘোষ), *রাষ্ট্রসংঘ* (কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পরিষদ, ১৯৮৪)
৬০. এম এ ওয়াজেদ মিয়া, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ* (ঢাকা ঃ ইউপিএল, ২০০০)
৬১. কাজী জাহেদ ইকবাল, *আন্তর্জাতিক রাজনীতি সমস্যা ও সঙ্কট* (ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০১)
৬২. ডঃ এম ওয়াজেদ আলী, *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস*.(ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০০)
৬৩. ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত* (ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯)
৬৪. তালুকদার মনিরুজ্জামান, *তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা* (ঢাকাঃ অবসর প্রকাশ,া ১৯৯৫)
৬৫. তারেক শামসুর রেহমান, *বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি* (ঢাকাঃ এম আব্দুল্লাহ্ এন্ড সন্স, ১৯৯৩)
৬৬. তারেক শামসুর রেহমান, *বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর,* (ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯)
৬৭. নীহারঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস আদি পর্ব* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, সন উল্লেখ নেই)
৬৮. বি এম আব্বাস এ টি, *ফারাক্কা ব্যারাজ ও বাংলাদেশ* (ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৮৮) ৬৯. মঈদুল হাসান, *মূলধারা–৭১* (ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯৫)
৭০. মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশঃ শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল* (ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৮৭)
৭১. মুনতাসীর মামুন, *স্মৃতিময় ঢাকা* (ঢাকা ঃ পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৯২)
৭২. মনোয়ারুল ইসলাম (সম্পাদনা), *গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত* (ঢাকাঃ দিব্য প্রকাশ, ১৯৯৭)
৭৩. মোঃ আব্দুল হালিম ও ফেরদৌস হোসেন, *স্নায়ু যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতি* (ঢাকাঃ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৫)
৭৪. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪)
৭৫. রফিকুল ইসলাম পিএসসি. *স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০* (ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯১)
৭৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১ম ও ২য় খণ্ড* (কলকাতাঃ জেনারেল, ১৯৮৮)
৭৭. রাও ফরমান আলী খান, *বাংলাদেশের জন্ম* (ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯৬)
৭৮. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *বাঙালির জাতীয়তাবাদ* (ঢাকাঃ ইউ পি এল, ২০০০)
৭৯. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪)
৮০. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশ, দক্ষিণ এশিয়া ও সাম্প্রতিক বিশ্ব* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬)
৮১. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশ ,দক্ষিণ এশিয়া ও বহির্বিশ্ব* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪)
৮২. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশ ও বর্তমান বিশ্ব* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫)

www.pathagar.com

৮৩. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা* (ঢাকাঃ ডানা প্রকাশনী, ১৯৮২)
৮৪. হাসানউজ্জামান, *বাংলাদেশঃ রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিকীকরণ* (ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯১)
৮৫. হুমায়ুন আজাদ, *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫)
৮৬. ক্ষেত্র গুপ্ত, *বাংলা সাহিত্যের সময় ইতিহাস* (ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০০)

www.pathagar.com

www.pathagar.com